স্মরণ

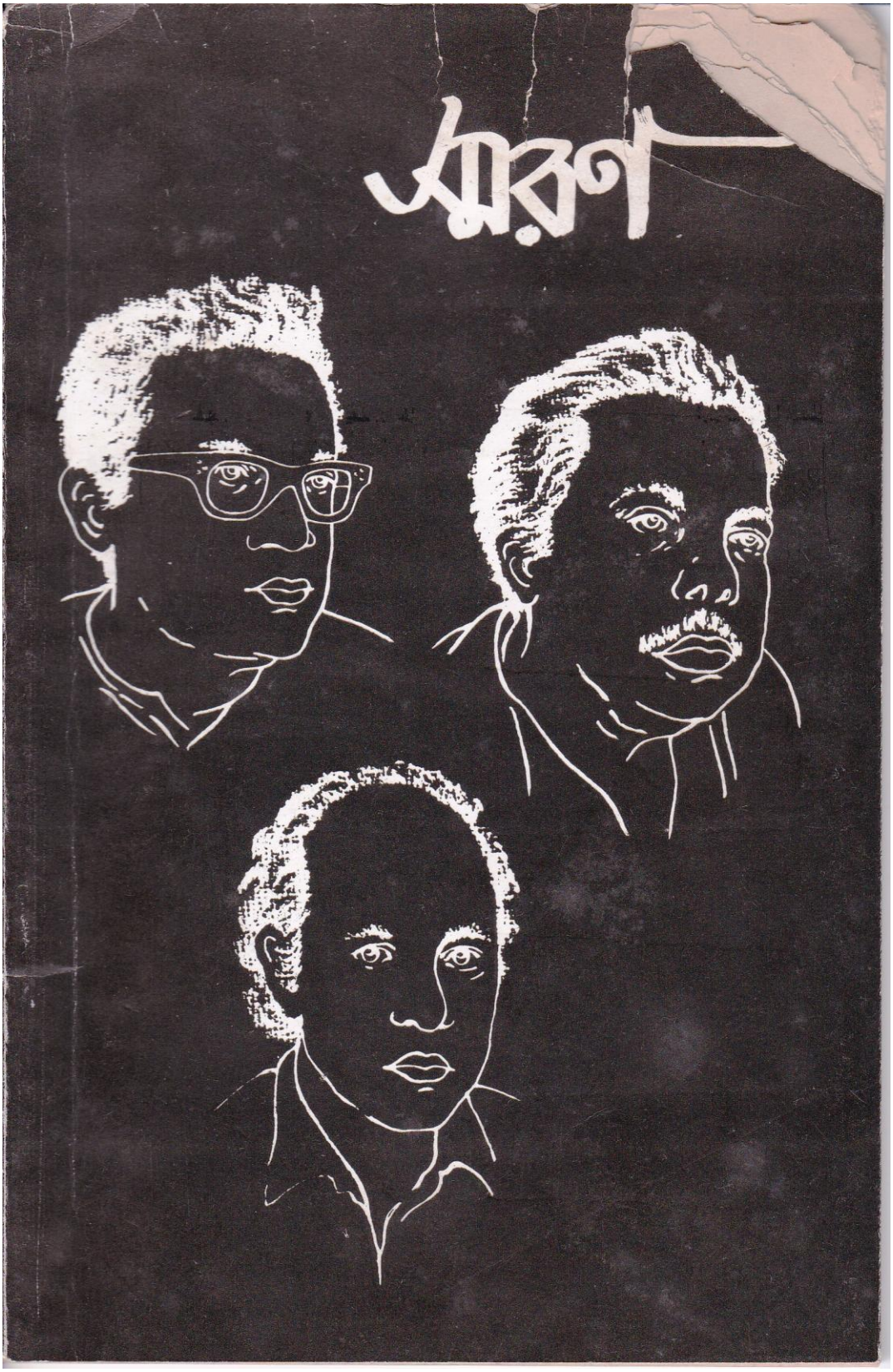

স্মরণ

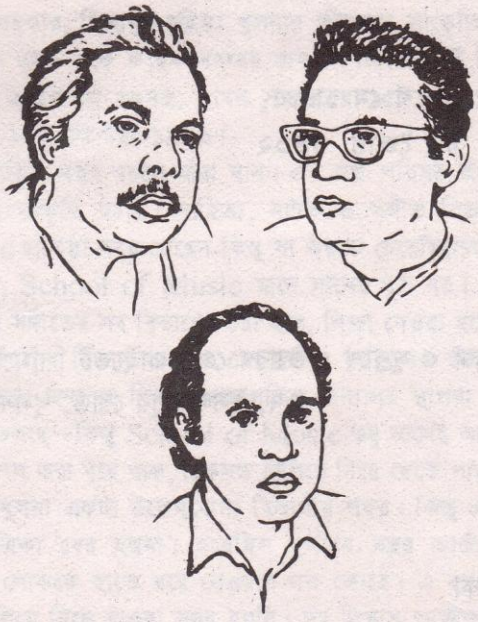

সম্পাদনায় ঃ ডাঃ এম, এ, মানাফ

স্মরণ

প্রকাশনায় ঃ স্কুল অব মিউজিক
শের-ই-বাঙলা রোড, খুলনা।

প্রকাশকাল ঃ ২২শে মে ১৯৯৫,
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে ঃ উত্তরণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫৭, ইসলামপুর রোড, খুলনা।

মূল্য - পঁচিশ টাকা

ভূমিকা

আজীজ খান, সাধন সরকার, মিজানুর রহিম! খুলনার ক্ষীয়মান সাংস্কৃতিক জগতের তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! একে একে কয়েক বছরের ব্যবধান তিনজনেরই তিরোভাব। আজীজ খানের মৃত্যু ২২শে মে ১৯৭৫, সাধন সরকারের ১৫ই জুন ১৯৯২ আর মিজানুর রহিমের মৃত্যু ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩।

আজীজ খান মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। এই স্বল্প পরিসর জীবনের প্রায় সবটুকু কেটেছে তাঁর সংস্কৃতি চর্চায়। সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত বিভাগে। তিনি School of Music প্রতিষ্ঠা করে গেছেন-কিন্তু যা করতে চেয়েছিলেন তা আজো হয়নি। তিনি বলতেন, School of Music মানে গানের স্কুল নয়। এটা একটা Institution এখানে সঙ্গীতের সব বিভাগের চর্চা হবে, শিক্ষা দেওয়া হবে, গবেষণা হবে, লাইব্রেরী ও প্রকাশনা বিভাগ থাকবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর গোড়া পত্তনের জন্য যে শিশু মনোজাগতিক বিদ্যালয় স্থাপনা করেছিলেন সেটা আজ ভালভাবে চলছে—কিন্তু School of Music শুধু নামেই আছে। আমরা তাঁর আরব্ধ কাজকে শেষ করা দূরে থাক, ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না।

গর্ব করে বলে থাকি খুলনা একটা উল্লেখযোগ্য বিভাগীয় শহর। কিন্তু এখান থেকে একটাও সাহিত্য পত্রিকা বের হয়না। হয়েছিল দু-তিন বছর আজীজ খানের 'স্বরলিপি'। এবং তা লোককে হাতে ধরে দেওয়ার মত কোরে। এ ব্যাপারেও তার শুরু করা কাজকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। দৃঢ় বিশ্বাস আজীজ খান বেঁচে থাকলে এমনটি হতো না। কারণ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো লোকের সংখ্যা খুব কম এবং এঁদের দ্বারাই সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও চিত্রকলার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সাধন সরকারের মত একজন উঁচু মাপের লেখক, গায়ক ও সুরকার কেন যে খুলনার মত একটা ছোট শহরে লোক চক্ষুর অন্তরালে নিজেকে নিঃশেষ করে গেলেন তা আজও আমরা বুঝতে পারিনা।

তবে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৈয়দ সুলতানের কথা চিন্তা করলে মনে হয় এরকম কিছু প্রতিভা থাকে যাঁরা নন্দন চর্চাকে ব্যবসায় পরিণত না করে বা প্রচারে না গিয়ে আপন ভুবনে আপন আনন্দে মত্ত থেকে বিদায় নেন। এতে দেশের ও জনগণের অনেক কিছু পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সাধন সরকারের লেখার, গানের ও সুরের বিরাট ভাণ্ডারের যা কিছু এখনও উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা সম্ভব তা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। তা না হলে একটা বিরাট সম্পদ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চোখের আড়ালে থেকে যাবে।

মিজানুর রহিম আর এক ব্যক্তিত্ব যিনি আবৃত্তি, অভিনয়, সঙ্গীত, ফটোগ্রাফি, এবং সাহিত্যের সব শাখায় অনায়াসে বিচরণ করতেন। কিন্তু তাঁর একটা ত্রুটি ছিল—তিনি বড় অলস ছিলেন। তিনি আমাদের অনেক কিছু দিতে পারতেন কিন্তু তা না করে শুধু নিজেই উপভোগ করে গেছেন।

খুলনায় সংস্কৃতি চর্চায় এই তিনজনকে সব সময় একত্রে পাওয়া গেছে— যদিও তিনজনের বিচ্ছেদ বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। আজীজ খানের সুচিকিৎসা হয়নি। সাধন সরকার যে দারিদ্র ও রোগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় এবং মিজানুর রহিম পুঁজিবাদী সমাজের যে বিলাসী চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসায় মারা গেলেন—কোন সভ্য দেশে সেটা কল্পনা করা যায় না।

আমরা এঁদের নিয়ে একটা স্মরণিকা বের করবার আয়োজন করছি—নতুন প্রজন্মের কাছে এঁদের পরিচয় তুলে ধরতে এবং তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?	- সুশান্ত সরকার	১
কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	- অসিত বরণ ঘোষ	৭
স্কুল অব মিউজিক ও আজীজ খান	- আকরাম হোসেন	১৩
ব্যক্তিগত পরিচয়ের আলোকে আজীজ খান	- ডাঃ এম.এ. মানাফ	১৭
সুর স্রষ্টা সাধন সরকার	- কালিপদ দাস	২০
কেউ আর ডাকবে না কোন জলসায়	- সুশান্ত সরকার	৩৩
সাধন সরকার মৃত্যুর দু'বছর পরে	- দীপা বন্দোপাধ্যায়	৩৯
আমার দেখা সাধন সরকার	- গৌরী শংকর ঘোষ	৪২
মিজানুর রহিম স্মরণে	- ডাঃ এম. এ. মানাফ	৪৭
আমার দৃষ্টিতে মিজান ভাই	- ডাঃ মহবুবর রহমান	৫০
আমার অগ্রজ	- জিল্লুর রহিম	৫৩
কাছের মানুষ মিজান সাহেব	- সুফিয়া খানম	৫৭
স্মরণার্থে প্রার্থনা	- মাহমুদ আলম খান	৬০

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?

সুশান্ত সরকার

কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের সাথে আস্তে সুস্থে, রয়ে বসে, ধীরে ধীরে ভাব জমে পরিচয় প্রগাঢ় হয়, আবার কিছু মানুষ থাকেন যাদের সাথে বলা নেই, কওয়া নেই দুম্ করেই যেন পরিচয় হয় না– পাকাপাকি মনের মানুষ হয়ে যান তাঁরা। মরহুম আজিজ খান ছিলেন এই দলের মানুষ– ভাবখানা এমন– এলেন– দেখলেন– যেন জয় করে নিলেন। আমার সাথে তাঁর মনের বাঁধন এমনি করেই ঘটেছিল। দিন তারিখ মনে নেই– তবে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় অধুনা অস্তিত্ব লুপ্ত, আহসান আহমেদ রোড আর শামসুর রহমান রোডের সংযোগস্থলে পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডের অফিসের উল্টো দিকে ভাঙ্গাচোরা রংওঠা বেঞ্চ পাতা সেই বিখ্যাত গোলপাতার ঘর, দাদুর চায়ের দোকানে। সমকালীন খুলনার বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীরা যেখানে বসতেন, রাজনীতি–সমাজনীতি– সাহিত্য– সংস্কৃতি- কোনটাই আলোচনায় না এসে পারতো না– এখানেই একদা এক দুপুরে তাঁর সাথে আমার পরিচয়।

সুদর্শন গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী এক সুপুরুষ, মাথা ভর্তি কুঞ্চিত ঘনকেশ– ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত হাতে একটি কালো ফাইল নিয়ে যেন স্রোতের বেগে ঢুকলেন– প্রয়াত সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকারের পাশে গিয়ে একেবারে আয়েশের ভঙ্গীতে বসে পড়লেন। সাধন বাবুর সাথে আমার ব্যক্তিক পরিচয়ের সুবাদেই ওখানে আমার গতায়ত। এমন সৌম্য দর্শন ব্যক্তিটি আমার অস্তিত্বকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে সাধন বাবুর সাথে কথা জুড়ে দিলেন– মাষ্টার মশায় সম্বোধনে। তিনি কি যেন একটা করছেন– গানের স্কুলটি স্কুল হবে, বলে অনুমান হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম স্কুল অব মিউজিকের গোড়া পত্তনের ব্যাপার। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রটিকে পুনরুদ্ধার করা এবং পাশাপাশি প্রায় সহায়সম্বলহীন সঙ্গীতবেত্তাদের পূনর্বাসিত করা ছিল প্রাথমিকভাবে স্কুল অব মিউজিকের উদ্দেশ্য। তার সাথে যুক্ত ছিল আজিজ খান নামক একজন একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মৌলিক চিন্তা, চেতনা ও আদর্শ। শেষ মুহূর্তে সাধন সরকার আমার কথা বলতেই তিনি আমাকে যেন এতক্ষণে দেখলেন- বললেন– মাষ্টার মশায় আপনার কথা বলেছেন, কাজ করতে হবে কিন্তু। আমার প্রত্যুত্তর করার কিছু ছিল না– কেননা, কি কাজ আমাকে করতে হবে, কোথায়, কেন– কিছুই আমি জানতাম না তখন। কিন্তু মানুষটাকে আমার মনে ধরেছিল খুব।

প্রকৃত অর্থে আজিজ খান নামক ব্যক্তিটিকে আমি তেমন চিনতামই না। যদ্দুর পরে জেনেছি- তাও কিছুটা ভাসাভাসা- আমার বাড়ী বাগেরহাটে, তাঁর বাড়ী ছিল বাগেরহাটের অন্তপাতী মূলঘরে। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন যশোরে। রাজনীতি করতেন একদা- যে রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং আদর্শ তাঁর সারা জীবনের কর্মে এবং চিন্তায় সমান প্রতিফলিত ছিল। যশোর থেকে খুলনায় এসে প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও, কর্মের সাথে আদর্শের ভিন্নতা তাঁর কখনো হতে দেখেছি বলে মনে হয় না। আর এখানেই তাঁর প্রকৃতি এবং চরিত্র দুটোই ছিল ভিন্ন। দশজনের সাথে এক সারিতে তাঁকে বিচার করা যায়নি কোন দিন।

পঞ্চবীথির মোড়ে, একটা পুরানো লাল দোতলা দালানে প্রতিষ্ঠিত হলো স্কুল অব মিউজিক। এবং বলতে গেলে আজিজ খান সাহেবের একক উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টায়। তাঁর পাশাপাশি ছিলেন আকরাম হোসেন, সাধন সরকার, মিজানুর রহীম এবং আমরাও বেশ কয়েকজন গিয়ে জুঠেছিলাম। স্কুল অব মিউজিককে তিনি একটি গানের স্কুল বা গান শেখানোর ব্যবসা কেন্দ্র করতে চাননি, আজিজ ভাই চেয়েছিলেন- স্কুল অব মিউজিকের ভেতর দিয়ে বাংলা সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলার ঐতিহ্যগত ধারা নিয়ে গবেষণা, সংরক্ষণ, প্রতিপাদন- চর্চা করার একটি পটভূমি তৈরী করতে। মোদ্দা, এদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিক মানুষের জীবনের সাথে, যে আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবাহিত তাকে পুনরুদ্ধার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই চেতনায়, মননশীলতায় গড়ে তুলতে। আর এই ক্ষেত্রে খান সাহেব ছিলেন আপোসহীন ব্যক্তি। বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া তাঁর ধাতে ছিলনা।

স্কুল অব মিউজিকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে খান সাহেব যে বিষয়টি প্রথম চালু করলেন- পূর্ণিমা সম্মেলন। পূর্ণিমা সম্মেলন বলতে পূর্ণিমার রাতে চাঁদের আলোয় খোলা সেই পুরানো বাড়ীর ছাদে গান, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা; এমনকি সব কিছুর সমালোচনা। খান সাহেব সব কিছুই করতেন কিন্তু থাকতেন সবার পেছনে। কোন বিষয়টি তার নজর বা কান এড়িয়ে যেতনা- যেতে পারতো না। একবার বেশ মনে পড়ছে, খান সাহেব একজন সঙ্গীত শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানালেন পূর্ণিমা আসরে তিনি ভাব গান গাইবেন। আমরা যাঁরা নিয়মিত তাঁরা ছাড়াও বেশ কিছু লোক উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত শিল্পীটি বেশ কটি গান গাইলেন। হঠাৎ করে তিনি কেন জানিনা সে সময়ে প্রচলিত একটি সিনেমার গান ধরতেই পেছন থেকে উঠে খান সাহেব তাঁকে থামিয়েই দিলেন না, তাঁর গান বন্ধ করে দিলেন। শিল্পী ভদ্রলোক একতারা বাজিয়ে শ্রোতাদের বেশী মন পাবার জন্যে গানটি ধরলেন আর হিতে হলো বিপরীত। এই আজিজ খান সাহেব শুনেছিলাম একদা একটি পূর্ণদৈর্ঘ সিনেমাও নাকি প্রযোজনা করেছিলেন- না আমার সে সিনেমা দেখার সৌভাগ্য হয়নি এবং আশ্চর্যের ব্যাপার আজিজ ভাই নিজে কোনদিন তাঁর সিনেমার কথা কখনো ভুল করেও বলেন নি।

স্কুল অব মিউজিকের উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যগত বাংলা সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান- তার

গবেষণা, সংরক্ষণ, প্রতিপাদন। এই প্রেক্ষাপটে আজিজ ভাই এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল বাংলা সঙ্গীতের প্রথম প্রাপ্ত নিদর্শন চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকার সুরারোপ। যে কাজের ঋত্বিক ছিলেন সাধন সরকার। চর্যাপদ সমূহ মূলত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন সঙ্গীত। পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকে রচিত বাংলা গান। এই গান সেই সময়ে প্রচলিত রাগে এবং তালে নিবন্ধ– যা' সাম্প্রতিক কালে অবলুপ্তই নয়– কোন সঙ্গীত শাস্ত্রে তার উল্লেখ পাওয়া দুরূহ। খান সাহেব এবং সাধন সরকার তাবৎ সঙ্গীত কোষ আতিপাঁতি খুঁজে, এমনকি লক্ষ্ণৌ মিউজিক কলেজের সঙ্গীত শাস্ত্রের ইতিহাসের অধ্যাপকের সাথে পত্রযোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেই মোতাবেক উল্লিখিত রাগের একেবারে কাছাকাছি সমঠাঠের রাগে– যার চরিত্র একই রকম– চর্যাপদের সুরারোপ করা হয়। আজিজ খান সাহেবের আগ্রহে এবং কৌতুহলে এই চর্যাপদের সুরারোপ ও স্বরলিপি করেন সাধন সরকার।

শুধু চর্যাপদ নয় স্কুল অব মিউজিকের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কালজয়ী গীতিকবিতা ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বেশ কিছু অংশ কীর্তনাঙ্গে সুরারোপ ও স্বরলিপি করেন সাধন সরকার এবং মধুসূদনের সনেট 'বঙ্গ ভাষা' 'কপোতাক্ষ নদ' সুরারোপিত ও স্বরলিপি আবদ্ধ হয় আজিজ খান সাহেবের আগ্রহে এবং প্রচেষ্টায়। কবি সুকান্তের গীতিনাট্য অভিযান শুধু সুরারোপিত ও স্বরলিপিকৃত করেই আজিজ খান সাহেব ক্ষান্ত থাকেন নি, অভিযান মঞ্চায়িত করেছেন স্কুল অব মিউজিকের অনুষ্ঠানে। পরবর্তীতে 'ফসল' নামক স্বরলিপি গ্রন্থে অভিযান গীতিনাট্যের স্বরলিপি মুদ্রণ করে প্রকাশ করেছিলেন। শুধু ফসল নয় আজিজ খান সাহেবের অপরকীর্তি শিশু কিশোর তথা আগামী প্রজন্মকে জাতীয় শুদ্ধ ও সৎ সংস্কৃতি সচেতন করে গড়ে তুলতে, সঙ্গীতের অমোঘ ক্ষমতাকে তাঁদের চেতনার বিকাশের জন্য কাজে লাগাতে 'গঙ্গা ফড়িং, নামক ধারাবাহিক স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশ। 'গঙ্গা ফড়িং' গ্রন্থের জন্য আজিজ খান সাহেব নিজে গান লিখেছেন নিজে সুরারোপ করেছেন এমনকি স্বরলিপিও করেছেন। এ ক্ষেত্রে সাধন সরকার, আকরাম হোসেন প্রমুখ ছিলেন আজিজ খান সাহেবের সহগামী।

ফসল আর গঙ্গা ফড়িং স্বরলিপি গ্রন্থই নয় আজিজ খান সাহেবের সবচেয়ে মূল্যবান এবং অবিস্মরনীয় কীর্তি স্কুল অব মিউজিকের মুখপত্র ঋতু ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা 'স্বরলিপি'র প্রকাশ। তাঁর জীবদ্দশাতে তিনি ছিলেন এ পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক এবং সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহক। নিজের প্রেসে, নিজের গাঁটের পয়সায় কাগজ কিনে সেই বাজারে একটি পরিশুদ্ধ পত্রিকা প্রকাশ আদৌ সহজ সাধ্য ছিলনা। স্বরলিপি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভ থেকে একটু উদ্ধৃতি দেই;

আমাদের সামর্থ কম, সেজন্যে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার সাথে সাথেই দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপাখানায় যায়। আস্তে ধীরে যাতে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশিত হবার পরপরই আত্মশক্তি উবে গেল; হঠাৎ বাজার থেকে কাগজ উধাও হয়ে গেল। (স্বরলিপি ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৯৮১, পৃঃ ১৮১)

একথার পর সহজেই অনুমেয় কি নিদারুণ প্রতিকূলতার পথ পেরিয়ে তিনি স্বরলিপি পত্রিকার প্রকাশ চালু রেখেছিলেন। আগেই বলেছি স্বরলিপি পত্রিকার সব দায় ভার নিজের কাঁধে তিনি যেমন নিয়েছিলেন তেমনি আমরা যারা তরুণ, লেখালেখির বাতিক বেশ ঘুরপাক খায় মাথায় আমাদের জোর করে লেখক তৈরীর দায়িত্বও তিনি পালন করেছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ছে আমাকে দিয়ে যে সব কাজ আজিজ ভাই করিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম দুটি গল্প। স্বরলিপি পত্রিকার অনিয়মিত দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য আমাকে একটি গল্প লেখার দায়িত্ব দিলেন– সময় যায় আমার গল্প আর হয়ে উঠে না। একদিন রূঢ় ভাষায় শাসিয়ে দিলেন গল্প না হলে স্কুল অব মিউজিকে যেন আর পা না দেই। তাঁর শাসানিতে পড়ে এক কাঁচা গল্প লিখেছিলাম– গল্পটির নাম– 'এখন বসুন্ধরা'। আমার বিশ্বাস ছিল এ গল্প অন্তত খান সাহেব ছাপবেন না। পত্রিকা বের হলে– দেখা গেল– যথারীতি গল্পটি ছাপা হয়েছে, কিন্তু আমার নামের বানান ভুল। খান সাহেবের হাতে আমার নামের বানান অশুদ্ধ হবার কথা নয়, তিনি অকপটে জানিয়ে দিলেন গল্প যখন লিখেছি তা ছাপা হবেই, তবে আমাকে বাঁচাবার জন্যে নামের বানানটা অশুদ্ধই রাখা হয়েছে। আর এই আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হতে লিখলাম 'ভয়' গল্প। এটা নিয়েও বিব্রতকর অবস্থা। গল্পটি যখন খান সাহেবের হাতে দেই তখন গল্পটির নাম ছিল– মেঘ ভাঙ্গা রোদ। খান সাহেব গল্পটি পড়লেন মন্তব্যহীন তাঁর কালো ফাইলে পুরলেন– পত্রিকা বের হলো– মেঘ ভাঙ্গা রোদ গল্প পত্রিকার কোথাও নেই। গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে ভয়। এ নামকরণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মরহুম আজিজ খানের। ভয় গল্পটি আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ পুঁজ পাঁচড়ার পাঁচালীতে প্রথম গল্প হিসেবেই সংকলিত হয়েছে আজিজ খান সাহেবের স্মৃতিকে ধারণ করে।

খান সাহেব একবার যদি জিদ্ ধরতেন তাহলে, তা' করেই ছাড়তেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠান করলেন খুলনা ষ্টেডিয়ামে। ঐ অনুষ্ঠানে বাংলা সঙ্গীতের আদি যুগ অর্থাৎ চর্যাপদের কাল থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বাংলা সঙ্গীতের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে আমাকে বাধ্য করলেন 'বাংলা গানের ভাষ্য' নামে। অসংখ্য লোক সমাগমের সেই অনুষ্ঠানে এহেন প্রবন্ধ শোনার আগ্রহ থাকার কথা নয়। কিন্তু খান সাহেব নাছোড় বান্দা– গান শুনতে হলে– গানের ইতিহাস শুনতে হবে এবং এক রকম জোর করেই সে অনুষ্ঠানে আমাকে দিয়ে সেই প্রবন্ধ পড়ালেন। আমি নাজুক অবস্থায় পড়তেই বন্ধুবর গৌরীশঙ্কর ঘোষ যার নামে খান সাহেব ব্রাকেটে একটা পুং শব্দ লাগাতেন– গৌর দা আমাকে সাহসী করলেন– খান সাহেবের ঠেলা সামলাতেই হবে।

খান সাহেবের জন্য বাস্তবিক আমাকে আরো ঠেলা সইতে হয়েছে, সামলাতে পারিনি। কথাটা আজকে বলেই ফেলি। আগেই বলেছি স্বরলিপি পত্রিকার সবচেয়ে মূল্যবান রচনা 'বাংলা সাহিত্যে বিষয় বস্তুর সমস্যা' শিরোনামে ধারাবাহিক তথ্য সমৃদ্ধ এবং জীবনমুখীন গবেষণা মূলক প্রবন্ধ খান সাহেব লিখছিলেন। তিনি প্রবন্ধটি শেষ করে যেতে পারলে বাংলা সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারতো। এই বিষয়ের দ্বিতীয় কিস্তিতে তিনি বাংলাদেশের একজন নামকরা

কবির একটি আরবী ফারসী শব্দ বহুল গীতি কবিতা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। এবং রূঢ় ভাষায় কবির ব্যক্তিগত জীবনকে কটাক্ষ করে বেশ কিছু লজ্জাকর তথ্য উপস্থাপন করেন। ঘটনাক্রমে কবি আমার দেশের বাড়ীর অঞ্চলের বাসিন্দা এবং আমার শিক্ষক। বিষয়টি পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে যাবার পর সমালোচিত কবি খানসাহেবের কাছে গেলে- তিনি যাঁর কাছ থেকে তথ্য পেয়েছেন তাঁর নাম না বলে পদবী উল্লেখ করে বলেদিয়েছেন- জনৈক সরকার তাকে এ তথ্য দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের পূর্বপুরুষ তাঁদের বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করে সরকার হওয়ায় আমার উপাধিও সরকার হয়ে গেছে- আমার শিক্ষকের নিশ্চিত ধারণা জন্মে ঐ তথ্য সরবরাহকারী আমি। সেই মোতাবেক কবি এবং আমার শিক্ষক তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমাকে অভিযুক্ত করেন। আমি খান সাহেবের কাছে পড়ি কি মরি করে ছুটে যাই। তিনি তাঁর সহজ ঋজু ভঙ্গীতে আমাকে বিদায় করেন আপনি বলেননি, জনৈক সরকার বলেছে- আপনি ছাড়া আরো অনেক সরকার আছে যাঁরা কবিকে চেনে- কে বলেছে তা আপনাকে বলতে হবে কেন? আমি হতাশ হয়ে ফিরে আসি। তার অল্প ক'দিন পরেই খান সাহেব দেহরক্ষা করেন- আমার জানা হয়নি কোন সরকার তাঁকে তথ্য দিয়েছিলেন, এবং আমার শিক্ষকের ধারণাও বোধ করি জীবদ্দশায় পাল্টাবে না যে ঐ তথ্য সরবরাহকারক আমি- এই ঠেলা আমি সামাল দিতে পারিনি- আর পারবো না কোন দিন।

আজিজ খান সাহেব 'বাঙলা সাহিত্যে বিষয় বস্তুর সমস্যা' শেষ করে যাননি। বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে লেখক আছে, লেখা ও হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতই সমস্যা বোধ করি বিষয় বস্তুর। যে সমস্যা থেকে আজো বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র মুক্ত নয়। একটু উদ্ধৃতি দেইঃ

সমস্যা হলো কি লিখছি, কেন লিখছি, কার জন্যে লিখছি।
আমরা যাকে গল্প উপন্যাস কবিতা বা শিল্পের বিষয়বস্তু বলি, আসলে সেটা সাহিত্য শিল্পের বিষয়বস্তুর সিদ্ধান্ত। সামাজিক জীবনে জৈবিক মানুষের যে বিচিত্র জটিল অভিব্যক্তি, তারই অবিকল সত্যরূপ আবিষ্কারই সাহিত্য শিল্পের বিষয়বস্তুর কাজ। (স্বরলিপি, ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, গ্রীষ্ম- ১৩৮১, পৃঃ ১২২)

আজিজ ভাইএর এই লেখাটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, আজকে যখন ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভুলাবার লীলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলছে, সে ক্ষেত্রে ছিল বড় অপরিসীম, অন্তত এই অর্থে যে 'I write because I must. যাকে আমরা কমিটমেন্ট বলি। এই কমিটমেন্টের শূন্যতা থেকে আদৌ আমরা মুক্তি পাবো কিনা তা'তে সন্দেহ আছে। আজিজ ভাই কমিটেড ছিলেন- তাঁর আদর্শে এবং বিশ্বাসে। তাই তাঁর সম্পর্কে বলতে হয়- 'I donot write because I can, I write because I must. বোধ করি তাই তিনি উপন্যাস লিখতে হাত দিয়েছিলেন। আমরা যারা আজিজ খান সাহেবের মোটামুটি কাছের ছিলাম তাঁরাও জানতাম না যে, আজিজ ভাই উপন্যাস লিখছেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বরলিপি পত্রিকার সম্পাদনা সম্পর্কিত কাজ করতে গিয়ে, আবিষ্কৃত হয়, 'মেঘলা ক্ষণের সূর্য স্বপ্ন' উপন্যাস। এটাও অসম্পূর্ণ। শিক্ষিত

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের প্রচণ্ড টানা পোড়েন– ঘাত প্রতিঘাত এবং মিথ্যাচার– শঠতা– রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি সব কিছু আবর্তন করে এক বিশাল পটভূমিতে– মেঘলা ক্ষণের সূর্য স্বপ্ন উপন্যাস– কিন্তু অসমাপ্ত।

বোধকরি আজিজ ভাই এর জীবনটাই অসমাপ্ত থেকে গেছে। ক'দিন দেখা হয় না। আকরাম হোসেন বললেন– তার শরীরটা খারাপ। ঘরে সহধর্মিনী একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক কিন্তু আজিজ ভাই তাঁর ওষুধতো খাওয়া পড়ে মরুক, কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নেন নি কোনদিন। হঠাৎ গ্রীষ্মের দুপুর, ভাত খাচ্ছি, কে যেন এসে বলে গেল খান সাহেব নেই। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও ছুটে গেলাম তার শূন্য দিয়ে শুরু করা বাড়ীতে। শক্ত, তেজীপুরুষ আজিজ খান সাহেব এক মাথা ধূসর কোকড়ানো চুল নিয়ে যেন শুয়ে আছেন– একটু পরে উঠে বলবেন– এক কাপ চা দাও।

মিডু (আজিজ খান সাহেবের একমাত্র কন্যা) ছুটে এসে ডুকরে জড়িয়ে ধরলো– কাকা– আব্বা নেই। তিঁসা একেবারেই বাচ্চা– ওর তেমন কিছু বোঝার বয়স তখন হয়নি। ভাবী অর্থাৎ ডাঃ শামছুননাহার কাঁদছিলেন না পাথর হয়েছিলেন আমি জানিনা। আজিজ খানের মরদেহ মূলঘর নেয়া হবে কিনা সে আলোচনা আমার কানে এসেছিল– মিজান ভাই বা আকরাম বা অন্য কেউ আমার কাছে কি যেন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন– আমি উত্তর দিতে পারিনি– আমার শুধু মনে হয়েছে– দুম করে যেমন আমার সাথে দেখা হয়েছিল– তেমনি দুম করেই তিনি চলে গেলেন জীবনটাকে একেবারেই অসমাপ্ত রেখে। 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে– আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে– তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে'– আজিজ খানকে, রাখা গেল না– আমাকেই বা বাঁধবে কে?

‘কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে’

—অসিতবরণ ঘোষ

ষাটের দশকের শেষ দিকে যখন মাগুরা কলেজ ছেড়ে খুলনায় কমার্স কলেজে যোগদান করি তখন আমাদের এই ভূখণ্ডের রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে চলছিল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এক দারুণ ক্রান্তিকাল। বাঙ্গালী সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির অবিসংবাদী কালপুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠির ষড়যন্ত্র ততদিনে গোপনতার সকল আচরণ খসিয়ে নগ্ন আকার ধারণ করেছে। কিন্তু দুঃশাসকেরা যত বেশি তৎপর হতে থাকল, এ-দেশের ছাত্র সমাজ ও সংস্কৃতিকর্মীরা তত বেশি সোচ্চার হয়ে উঠলেন। সংস্কৃতি চর্চার সাথে সচেতন বা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন এমন অসংখ্য মানুষও সেদিন অন্তর্গত মাটির টানে এই দ্রোহের সাথে যুক্ত হন। এ-সবের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি এক ধরণের উচ্ছ্বাসমিশ্রিত অনুরাগ জন্ম নেয় রাজধানী ঢাকা থেকে বহু দূরের ছোটবড় শহর গঞ্জেও। অথচ আমরা অবাক হয়ে বিপন্ন বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাক্-রাজমুক্ত স্বাধীন স্বদেশ অর্জনের অব্যবাহিত পরে প্রাক-স্বাধীনতা কালের সেই সংস্কৃতিপ্রীতির দুর্বার জোয়ার অকস্মাৎ স্তিমিত হয়ে সৃষ্টি হল পেয়েও সব হারানোর প্রবল ভাঁটার এক মর্মান্তিক দুঃসময়। জনগণমন অধিনায়ক একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতা যুদ্ধে মোড় নেয়, যদিও সে-যুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে হাজারো মানুষ অংশ গ্রহণ করেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। প্রায় দশ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলাম; এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু সুষ্ঠু ও গঠনমুখী পূর্ব পরিকল্পনার অভাবে স্বাধীনতার পর পরই সেই দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের একটি ব্যাপক অংশের মধ্যে যে-সীমাহীন দূর্নীতির প্রাদুর্ভাব দেখা গেল তারই বিষময় প্রভাব বিভিন্ন ভাবে সংক্রামিত হল জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে। বলা বাহুল্য, এই দুষিত-সংক্রমণের হাত থেকে সেদিনের শিক্ষাঙ্গন ও সংস্কৃতিঅঙ্গন রক্ষা পায় নি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতার আড়ালে এ-দেশের যে সামগ্রিক সর্বানাশ আজ দীর্ঘদিন থেকে ঘটে চলেছে এখান থেকেই তার অভিশপ্ত জয়যাত্রার শুরু। লালসালোলুপ নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি ছাত্র সমাজের নেতৃত্বদান-কারীদেরকেও সেদিন স্বাভাবিক ভাবেই প্ররোচিত করল পরীক্ষায় ব্যাপক দূর্নীতির আশ্রয় নিতে। সে-সব হৃদয়পোড়া বেদনার ভাষ্য আজ এ-দেশের ইতিহাসেরই এক দুরপনেয় কলংকিত অধ্যায় হয়ে রইল।

সেদিনকার নেতৃবৃন্দের ব্যাপক অংশের সেই ভ্রষ্টতা ও তার পরিণামী ব্যর্থতার ফলে একদিকে একদল মানুষ হন্যে হয়ে উঠেছিল আখের গোছানোর কাজে, আর এক দল মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া সহ্য করতে না পেরে রুদ্র রোষে ক্রমশঃ ফুঁসে উঠতে থাকলেন প্রতিকারের আশায়। বলা বাহুল্য, এরা মূলত ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। শুরু হল আর এক যুদ্ধ। এই নতুনতর যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিনকার প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীরা, যাদের অধিকাংশকেই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন অনেক চড়া মাশুল দিতে হয়েছিল, তারা অসহায় হয়ে মুখ গুজলেন হতাশার মরুবালুর ভিতর, উটপাখির মত। সমস্ত দেশে বিরাজমান সেই নৈরাজ্য ও হতাশার ঢেউ এ-দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী এই খুলনাতেও এসে আঘাত করল খুব স্বাভাবিক ভাবেই। বাংলার ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন ছিল অবিস্মরণীয় আনন্দের ও উন্মাদনার, অন্যদিকে তেমনি যেন তা হয়ে উঠল এক মহতী বিনষ্টির। চার্লস ডিকেন্সের সেই অনুপম প্যারাডক্স-এর অনুসরণে নির্দ্বিধায় বলা যায়; It was the best of time; it was the worst of time. It was a spring of hope; it was a winter of despair. We had everything before us; we had nothing before us.

চরম বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার সেই চরম দুঃসময়ে বন্দর নগরী খুলনার সংস্কৃতি অঙ্গনে 'স্কুল অব্ মিউজিক'-এর আবির্ভাব কালোমেঘের প্রান্তে স্বর্ণাভ রেখার মত এবং তা অবিস্মরণীয় তাৎপর্যবহ। মূলত সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলেও সেই রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নৈরাজ্যের কালে এই অনন্য প্রতিষ্ঠানটির তথা এর কর্ণধার আজিজ খান এবং এর নিকটতম সুহৃদ ও সহায়ক শক্তি মিজানুর রহিম ও সাধন সরকার এবং আকরাম হোসেন, কালিপদ দাস ও গৌরাশংকর ঘোষ প্রমুখদের। মুক্ত, উদার ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এই স্কুলটিকে খুলনার প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মিলনতীর্থে পরিণত করেছিল। প্রতিদিন সামান্য সময়ের জন্য হলেও একবার সেখানে ঢুঁ দেওয়া চাই, নইলে পেটের ভাত হজম হবে না, এমন বেশ কিছু সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পাগল মানুষের নিত্য আনাগোনা ছিল সেখানে, যাদের মধ্যে প্রধান তিনজনই আজ লোকান্তরিত। এ-কথা সর্বজনবিদিত যে শ্রদ্ধেয় আজিজ ভাই শুধু যে এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তা নয়, হিন্দু পুরাণের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অর্থাৎ স্রষ্টা- পালক-সংহারক এই ত্রয়ী ভূমিকাটি প্রায়ই তাকে একা গ্রহণ করতে হত। অবশ্য, এইমাত্র বলা হয়েছে সাধন দা, মিজানভাই, আকরাম হোসেন ও কালিপদদার ভূমিকাও এতটুকু নগণ্য ছিল না। আমরা যারা বয়েসে ও যোগ্যতায় এদের চেয়ে অনেক খাটো মাপের ছিলাম তারা শুধু আন্তরিকতার তাগিদেই পেছন থেকে গোলা-বারুদ-রসদ যখন যা পারি যোগান দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি মাত্র; আসল যুদ্ধ যা করবার তা করেছেন এঁরা কজন, যাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা অনেকেই এবং সামগ্রিক ভাবে খুলনার প্রগতিশীল সংস্কৃতিধারা অনেকাংশে ঋণী এবং সে ঋণ অপরিশোধ্য।

আজিজ ভাই ছিলেন মুক্ত ও বুদ্ধ স্বভাবের মানুষ। চিন্তাচেতনায় ও ধ্যান ধারণায় সব সময় আমরা যে তার সহকর্মী ছিলাম তা নয়, তথাপি তার মতামতকে আমরা শ্রদ্ধা করতাম একারণে যে তাতে তার প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও অকপটতা বিরাজ করত এবং আমাদের ভিন্ন মত সত্ত্বেও আমাদেরকে তিনি অনুজের মতই ভালবাসতেন। সে ভালবাসায় কোন কৃত্রিমতার ছোঁয়া ছিল না। মানসগঠনে আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়েও ভিতরে ভিতরে তিনি এতখানি বাঙ্গালী ছিলেন যে তার নামের পাশে 'খান' উপাধিটি একান্ত বেমানানই মনে হত। ইহলৌকিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির সোনার হরিণের পিছনে না ছুটে বাঙ্গালী যখনই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে অন্যতর এক আলোর আহবানে ও আহ্বানে, ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর ক'রে কিছুটা বাউল, কিছুটা বাউন্ডুলে হয়ে উঠেছে তখনই সে তার নিজের সাড়ে তিন হাত উচ্চতার সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। এই পারার পেছনে একদিকে থাকে দেশ-মাটি-মানুষের প্রতি সহজিয়া প্রেমের টান, অন্যদিকে বাক্য ও মনের অতীত সেই মুক্তির আকাঙ্খা বা আস্পৃহা যার ঠিকানা 'আলোয় আলোয়, এই আকাশে'। আজিজ ভাইয়ের স্ব-ভাবের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে ছিল চিরকালীন বাঙ্গালী মন-মানসিকতার এই 'ছোট আমি'কে বিলিয়ে দিয়ে 'বড় আমি'-কে বুকে তুলে নেবার মহৎ ভারটি। মন আর বন, এদের মধ্যে শাব্দিক বা ধ্বনিগত মিল-এর ঊর্ধে একটা গভীর সাদৃশ্য আছে আর সেটা হিসেবের মধ্যে রেখে বলা যায় আজিজ ভাই বাড়ীর ভাত খেয়ে ঐ বনের মোষ (আসলে তা সহস্র মানুষের মনেরই মোষ) তাড়িয়ে গিয়েছেন তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে যা দুঃখজনকভাবে অসময়ে অবসিত। তার মেধা-মনন ও কর্মদক্ষতার সাথে যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় ছিল না বা আজও নেই তাদেরকে বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বোঝানো যাবে না যে কিছু কিছু বিষয়ে তিনি কতটা সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। 'স্কুল অব মিউজিক'-এর নামকরণ নিয়ে একেবারে প্রথম দিকে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত অনেক বুদ্ধিজীবিরই ইংরাজী 'স্কুল' শব্দটি সম্পর্কিত সংকীর্ণ ধারণার ভ্রান্তি তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। এই শব্দটির অর্থ যে কত ব্যাপক তা তার চারপাশে বা খুলনা শহরের অনেকেই সেদিন জানতেন না। ঠিক 'মিউজিক' শব্দটিরও বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা সেদিনকার সেই আড্ডায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। সাহিত্য, শিল্পি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এত সারগর্ভ, বহুমাত্রিক, বিশ্লেষণ ধর্মী ও সরস আলোচনা ও এক বিতর্ক স্বাধীনতা উত্তর কালে খুলনার আর কোন সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে হতে দেখিনি। অর্থাৎ, এক কথায়, 'সত্তর' দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা অব্যবস্থা ও অবক্ষয়ের সেই দিনগুলিতে এই বন্দরনগরীর ক্ষমতা লোলুপ, অর্থগৃধ্নু ও পদলেহী অথচ পায়াভারী সমাজের প্রায় অগোচরে 'খুলনা স্কুল অব মিউজিক' অনন্ত মরুতৃষার মাঝে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল এক তৃষ্ণাহর অনুপম মরূদ্যান রূপে। আলাপের ছলে প্রায়ই সৃষ্টি হত তুমুল আড্ডা। কখনো মধ্যমনি আজিজ ভাই, কখনো বা মিজান ভাই আবার কখনো বা সাধন দা। আমাদের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠদের একটি দল ছিল এবং 'ঝড়' মূলত তারাই তুলতেন। প্রত্যেকেরই সামনে প্রায় সময়েই যদিও চায়ের কাপ থাকত তথাপি সে-সব ঝড়কে কখনেছি চায়ের পেয়ালার ঝড় ('a

storm over a tea-cup') বলে খাটো ক'রে দেখার উপায় ছিল না, সেকথা আগেই বলেছি। বরং সেই সব ঝড় আমাদের চৈতন্য লোকের পুঞ্জীভূত অনেক জঞ্জাল, অনেক জীর্ণ-শুক্‌নো পাতার আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যেত। আমরা অনেক বেশি সংস্কৃত হতাম, সমৃদ্ধ হতাম, সুস্থ ও স্বস্থ হতাম। আজিজ ভাইয়ের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, কারণ তিনি আপন প্রজ্ঞা ও প্রেমের শক্তিতে আমাদেকে সেখানে একত্রিত করতে পেরেছিলেন, প্রাচীন ঋষির মতই ছিল তার অনুচ্চারিত আহবান ঃ 'আয়ন্তু সর্বতঃ, স্বাহা'– সর্বদিক থেকে তোমরা এসো, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক। আজ খুলনায় নাটক-গান-বাজনা শেখানোর অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু আজিজ খান সাহেবের সেই প্রজ্ঞা, প্রেম ও সম্যক্ গঠনের ত্রয়ী শক্তির সমন্বয়ে যে সংস্কৃতি তীর্থ তিনি বিনির্মাণ করেছিলেন তেমন দ্বিতীয়টি আজ নির্মিত হয়নি। 'স্কুল অব মিউজিক'– এর এবং তার প্রাণপুরুষটির এই ঐতিহাসিক ও সৃজনধর্মী কর্মৈষণা সেদিন আমাদের অনেককেই এমন একটি বোধের উত্তরাধিকার দিয়েছিল যা না হলে আমরা অনেকেই আরো অনেকেরই মত একেবারে নষ্ট হয়ে যেতাম এতদিনে।

আজিজ ভাই সংস্কৃতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছোঁয়ার ও অনুভবের ও আপন সাধ্যমত তাকে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রবাহিত করার প্রবল তাগিদ অনুভব করতেন। তাই, বাংলা গানের ভাষ্য নিয়ে তাকে ভাবতে হয়েছে এবং মিজান ভাই ও সাধনদার মেধা ও শিল্পপ্রতিভা ও আকরামের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে সেই ভাষ্যের একটি সুষ্ঠু ও সৃজন ধর্মী রূপরেখা নির্মাণ করতে হয়েছে। ঐ একই কারণে তাকে– অর্থাৎ তাদেরকে সাহিত্য-সঙ্গীত সমন্বয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'স্বরলিপি' প্রকাশের সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মফঃস্বল গন্ধবর্জিত এই পত্রিকাটির সংখ্যাগুলি জাতীয় মান স্পর্শ করেছিল। এ ছাড়াও গানের স্বরলিপির বই 'ফসল-'এর কয়েকটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল তারই উদ্যোগে। সুকান্তের গীতিনাট্য 'অভিযান'-এর সার্থক সুরারোপ এবং অভিনয় ছিল 'স্কুল মিউজিক'-এর সাফল্যের মুকুটে অন্যতম সোনার পালক।

'স্কুল অব মিউজিক' বা আজিজ ভাইয়ের প্রসঙ্গে চিন্তা করতে গেলেই এত কথা, এত স্মৃতি ভিড় করে যে গুছিয়ে কিছু লেখা বা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। আর সে অগোছালো ব্যাপারটির দ্বারা ইতোমধ্যেই এই লেখাটি আক্রান্ত হয়েছে। কোন কোন ঘটনা তখন বড় হয়ে দেখা দিলেও আজ দেখছি তা তুচ্ছতার আবরণে মলিন হয়ে গেছে, আবার কোন কোন ঘটনা সেদিন তুচ্ছ বলে মনে হলেও আজ অবাক হয়ে দেখছি তা তুচ্ছতার ম্লানিমা ধুয়ে মুছে অপরূপ কান্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। এমনি একটি তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে আজকের এই অপরিশোধ্য দেনা শোধের ব্যর্থ প্রয়াস শেষ করব। প্রথমেই বলি, আজিজ ভাইয়ের একটি মধুর বদভ্যাস ছিল। সেটি আমার খুবই ভাল লাগত, কারণ তার সাথে অনেক বিষয়ে গরমিলের মাঝে যে-যে বিষয়ে আমার মিল ছিল তার একটি হল এই অভ্যাসটি। তিনি মাঝে মাঝে তার চেয়ে বয়েসে ছোটদের পেছনে লাগতেন। ঝড়ের আগে পূর্বাভাসের মত আমরা সেটা টের পেতাম যখন

তিনি আমাদের কাউকে বিশেষ একটি স্বরে বা intonation-এ নামের শেষে 'বাবু' বা 'সাহেব' suffix জুড়ে দিয়ে সম্বোধন করতেন। তো, যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে বন্ধুবর হাসান আজিজুল হক-এর অনুরোধে নোবেল বিজয়ী নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট-এর All that fall নাটিকাটি অনুবাদের কাজ সদ্য শেষ করেছি। ঠিক সেই সময় এক ছুটির দিনে সকালে সুপ্রিয় আবু বকর সিদ্দিক আমাদের বাসায় এসে হাজির। অনুবাদের কথা বলতেই তিনি অত্যন্ত সানন্দ চিত্তে আমাকে তা পড়ে শোনাতে বললেন। নাটিকাটি আগাগোড়া ব্যঞ্জনাধর্মী এবং এ কারণে অনুবাদ কর্মটি বেশ একটু দূরূহই ছিল। তো, নাটিকাটির মধ্যে একটি বাক্য ছিল; Wind blows! সহজেই অনুবাদ করেছিলাম 'বাতাস বইছে'। কিন্তু নাটিকাটির আবহের সাথে এই অনুবাদ আমার নিজেরই মনঃপুত ছিল না; তথাপি এর চেয়ে ভাল আমার বিদ্যোতে কুলোয়ও নি। সিদ্দিক সাহেব পাথরের মূর্তির মত নির্বাক ও নিস্পন্দ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অনুবাদ শুনে চলছিলেন। ঠিক এই বাক্যটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা ভঙ্গ করে আমার এক হাত চেপে ধরে সবিনয়ে বললেন, এখানে 'বাতাস বইছে'র বদলে 'হাওয়া দিচ্ছে' বললে ভাল হয় না? আমি হঠাৎ প্রাপ্তির আনন্দে চমকে উঠেছিলাম। আসলে নাটিকাটির Context-এ 'হাওয়া দিচ্ছে' কথাটি অনেক বেশি ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী ছিল। বন্ধুবরের শব্দ সচেতনতা ও ভাষা সম্পর্কিত সূক্ষ্মদর্শিতায় সেদিন মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। ফলে, ঐদিনই 'স্কুল অব মিউজিক'-এর সান্ধ্য আড্ডার বিষয়টি সোৎসাহে না বলা পর্যন্ত আমার পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না। ব্যাস, ঐ বলাই আমার 'কাল্' হয়ে দাঁড়ালো। ঐদিন কিছুই বুঝি নি। শুরু হল পর দিন থেকে। সান্ধ্য আড্ডা ঢুকতে না ঢুকতেই 'এই যে আমাদের অসিত বাবু এসে গেছেন, এবার তাঁর কাছ থেকে 'বাতাস' ও 'হাওয়া'র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আমরা কিছু জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনবো।' সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটল, হাসির। বলা বাহুল্য, সে হাসিতে আমারও যোগ না দেবার উপায় ছিল না। দীর্ঘদিন আমাকে আমার এই ভাবাতিশয্যের কারণে তার সামনে নানাভাবে মাসুল দিতে হয়েছে। আজ সমাজের চারিদিকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের ঘাটতি নেই; কিন্তু শৈল্পিক 'হিউমার' কোথায়? আজিজ ভাই সচরাচর বিদ্রূপ করতেন না, 'হিউমার' করতেন যার উৎসের গভীরে থাকে সূক্ষ্ম রসবোধ ও প্রেম। তার হিউমার ছিল শিল্পিত।

আমার প্রথম যৌবন যশোরের এক ক্রীড়ানুষ্ঠানের মাঠে আজিজ ভাইকে প্রথম দেখি, দূর থেকে, বহু-র ভিড়ে। সেদিনই দূর থেকে দেখে তাকে 'তাসের দেশ'-এর যুবরাজ বলে মনে হয়েছিল। তার চলনে-বলনে-দৃষ্টিতে যেন সেই 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'- জাতীয় একটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল। বহু বছর পরে স্বাধীনতা উত্তর কালে 'স্কুল অব মিউজিক'-এর পূণ্যতীর্থে যখন দ্বিতীয়বার তাকে দেখলাম, এবার একেবারে কাছে থেকে, তখন তার বয়েসে টান ধরেছে; তথাপি মন ও মননে, নিঃশ্বাসে ও বিশ্বাসে সেই যুবরাজ তখন রাজার আসনে। 'স্কুল অব মিউজিক'-ই ছিল তার স্ব-রাজ। তবে রাজা হয়েও আপন প্রাণধর্মের উদার ও প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তিনি তার চারপাশে এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন যে আমরা যারা সেদিন তার

এবং মিজান ভাই ও সাধনদার পাইক বরকন্দাজ ছিলাম, সেই আমাদেরকেও তিনি এমনি এক স্বাধিকার ও স্বাধীনতাবোধে প্রাণিত করেছিলেন যার নন্দিত ও নান্দনিক প্ররোচনায় আমরা অবলীলাক্রমে বলতে পারতাম; 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

দীর্ঘদিন হল সেই রাজা চলে গেছেন তার রাজ্যপাঠ ফেলে। প্রস্থান করেছেন নাটকের মধ্য থেকে। তার বেশ কিছু কাল পরে অল্প দিনের ব্যবধানে বিদায় নিলেন তার দুই প্রধান– একজন প্রধান মন্ত্রী, মিজান ভাই, অন্যজন প্রধান সেনাপতি, সাধনদা। শুধু স্মৃতিভারে আমরা পড়ে আছি, ভারমুক্ত তারা এখানে নাই।

এই স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ করতে পারলে সাহিত্যের দাবী হয়তবা কিছুটা মিটলেও মিটতো। কিন্তু বিবেকের ও মনুষ্যত্বের দাবী তাতে অপমানিত হত। 'স্কুল অব মিউজিক' কথা বলতে গিয়ে অনেক নিষ্ঠাবান মানুষের কথাই হয়ত বাদ পড়ে গেছে অজান্তে এ কারণে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু একজনের কথা না বললে অপরাধের শেষ হবে না। আজিজ ভাইকে দেখে দেখে আমার মাঝে মাঝে হিন্দু পুরান বর্ণিত সকল ললিতকলার আদি গুরু ভোলানাথ শিবের কথা মনে পড়ত। শিবের সমস্ত শক্তির উৎস হলেন শিবানী; ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর যেমন ব্রহ্মানী ও লক্ষ্মী। (সংস্কৃত ভাষায় 'শক্তি' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক বলেই এইভাবে দেবতার শক্তিকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে; আসলে এই দুই সত্তা মূলত এক ও অভিন্ন সত্তা।) তো, আজিজ ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তা ছিল সত্য। শুধু সাধারণ সত্য নয়, বিস্ময়কর ভাবে সত্য। তার সমস্ত সাংস্কৃতিক যজ্ঞের যত আহুতি তিনি দিয়েছেন, অন্নপূর্ণার মত তার প্রায় সবটুকুই প্রথম যুগে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন আমাদের অনেকেরই মাতৃস্বরূপিনী ভাবী ডাঃ সামসুন্নাহার অর্থাৎ, আজিজ ভাইয়ের সহধর্মিনী। অথচ কোনদিন অপ্রয়োজনে তো নয়ই, এমনকি বিশেষ প্রয়োজনেও নিজেকে এই কর্মযজ্ঞে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন নি তিনি। আজকের তথাকথিত অভিজাত সমাজে শুধুমাত্র স্বামীর পদগৌরব বা বিত্ত গৌরবকে একমাত্র পুঁজি করে এক শ্রেণীর মহিলারা আত্মপ্রকাশ ও প্রচারে প্রায়শই গলদ ঘর্ম। অথচ আপন গুণ ও গরিমার অধিকারী হয়েও, 'স্কুল অব মিউজিক' এর মত অতবড় উদ্যোগের এক প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়েও তিনি বরাবর নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন আপন স্বভাবের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দিয়ে। তার সেই নীরব ও নিবেদিত আত্মদান ব্যতীত ভোলানাথের মত সেই বেহিসেবী ও স্বভাব বাউল ও বাউণ্ডুলে মানুষটির পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আয়ুষ্মান করা সম্ভব ছিল না কোনমতই। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, নারীর প্রেয়সীরূপে পূর্ণতা তার প্রেয়সীরূপে। ভাবীকে আমরা অনেকেই তার সেই প্রেয়সীরূপেই পেয়েছি। সে পাওয়া বিরাট পাওয়া, তা সে 'স্কুল অব মিউজিক' এর ইতিহাসে লেখা থাক আর নাই থাক।

স্কুল অব মিউজিক ও আজীজ খান

আকরাম হোসেন

স্কুল অব মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হয় ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে। স্বাধীন হওয়ার পর সমবেত ভাবে একটা কিছু করার প্রস্তাব দিতে আজীজ খান লাফিয়ে উঠেছিলেন। 'ধর তক্তা, মার পেরেক' বলেই আমাদের সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন দাদুর দোকানে। আমরা বলতে উত্তরণ গোষ্ঠীর শওকত হোসেন, সঙ্গীত শিক্ষক সাধন সরকার ও আমি।

কাগজ কেনা হলো, কলম যোগাড় করা হলো, চা ও পানের অর্ডার দিয়ে সমবেত ভাবে কি করা যায় বিস্তারিত আলাপ করা হলো। ওখানে প্রধান আলাপের বিষয়বস্তু ছিল খুলনার বিশিষ্ট বিলুপ্ত যে কয়টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীত স্কুল ছিল তার সবগুলিকে একক করে একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় কিনা এবং এই উদ্দেশ্যে জানুয়ারী ১৯৭২-এর প্রথম দিকে পারাবত সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান থেকে আমি এবং উত্তরণ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শওকত হোসেন এর যুগ্ম আহবানে আজীজ খান-এর বাস ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লুপ্ত সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ও ছিন্নমূল অবস্থায় থাকা সমস্ত শিল্পীরা যোগদান করে এবং এরা সমবেত ভাবে আজীজ খানের নেতৃত্বে খুলনা স্কুল অব মিউজিক (বর্তমানে স্কুল অব মিউজিক) প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়।

বলতে দ্বিধা নেই 'স্কুল অব মিউজিক' বলতে আমিও প্রথমে গানের স্কুলই ভেবেছিলাম। তবে সম্মিলিত ভাবে আমরা বড় করে কিছু করছি বলেই ধারণা ছিল, কিন্তু কাজে নেমে আমার সে ধারণা বদলে গেল এবং এই ধারণা বদলানোর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আজীজ খানের। সঙ্গীত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, প্রতিপাদন প্রভৃতি নতুন নতুন কথা শুনলাম অবশ্য অনুধাবন করতে সময় লেগেছিল অনেক। সঙ্গীতের মাধ্যমে চরিত্র গঠন থেকে শুরু করে চিকিৎসা পর্যন্ত হাজারো কল্পনা তার মাথায় থাকতো সারাক্ষণ। শুধু আমি কেন অনেক সঙ্গীত গবেষকরাও তার কথা শুনে হা করে তাকিয়ে থাকতো— পাগলও কেউ কেউ ভেবেছে। তাই শেষ দিকে আজীজ খানকে দুঃখ করে বলতে শুনেছি "স্কুল অব মিউজিক" কাউকে বোঝাতে পারলাম না। সবাই গানের স্কুল বোঝে। তাই তার ইচ্ছা ছিল সম্ভব হলে গানের প্রশিক্ষণ তুলে দেওয়ার। যাতে কেউ অন্তত গানের স্কুল না ভাবতে পারে।

স্কুল অব মিউজিক প্রতিষ্ঠার শুরুতেই খুলনার সমস্ত শিক্ষকদের শিক্ষকতা করার সুযোগ দেওয়া হলো। অবশ্য ছাত্র ছাত্রী অপেক্ষা শিক্ষকদের সংখ্যাই ছিল বেশী। সম্মানী বাবদ সকলকেই কম বেশী দেওয়া হতো—এবং সেটা আজীজ খানের কাছ থেকে। শুধু শিক্ষকদের বেতনই নয়, বাড়ী ভাড়া, বেয়ারার বেতন, কাগজ, কালি, যাতায়াত খরচ সমস্তই আজীজ খানের পয়সায়।

খরচের কথা শুনে হয়তো ভাবতে পারি, টাকা থাকলে খরচ করা যায়। কিন্তু আমি জানি তার সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিল না। একটি প্রেস ছিল কিন্তু তা স্কুলের জন্যেই নিয়োজিত থাকতো সবসময়। পারিবারিক ব্যয় সংকোচ করে তিনি স্কুলকে সাহায্য করতেন। আমি নিজেই দেখেছি স্কুলের খরচ করার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে তিনি নিজের বাড়ীর খরচ কমিয়েছেন। এমনকি শেষ দিকে তিনি বাজারে যেতে চাইতেন না (যা কিনা তার চির দিনের অভ্যাস) কারণ নিজে গেলে খরচ হবে বেশী। পয়সার অজুহাতে নিজের বাড়ীর ছাদ তৈরী করেননি কিন্তু স্কুলের ঘর তৈরীর জন্য হাজার হাজার টাকা নিজে খরচ করেছেন।

১লা বৈশাখ স্কুলে বেশ ঘটা করেই উদযাপন করা হয়। প্রথম ১লা বৈশাখ উদযাপনের কথা এখনো মনে পড়ছে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সকলেই স্কুলে হাজির হয়েছিলো। আজীক খান এলেন। ১লা বৈশাখে স্কুলের সামনে মেলা বসে, তাই লোকজনেরও প্রচুর ভীড় ছিল। আজীজ খান আমাকে নিয়ে সারা মেলা ঘুরলেন। একটি মাটির সরস্বতী ও মাটির দুইটি বাঁশী কিনলেন এবং স্কুলে ফিরে ছাত্র ছাত্রীর ও সহকর্ম্মীর কানের কাছে তীব্র আওয়াজ করে অতিষ্ঠ করে তুললেন সবাইকে। আমিও একটি বাঁশী নিয়ে আজীজ খানের কানের কাছে বাজাতে আরম্ভ কলাম, তিনি আমার কানের কাছে লাগলেন বাজাতে। দেখতে দেখতে ছাত্র ছাত্রীদের হাতেও বাঁশী এলো। ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক ও সহকর্ম্মী একাকার হয়ে গেল আনন্দ উৎসবে। সন্ধ্যায় সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে প্রথম পহেলা বৈশাখ উৎসব উদযাপন শেষ হলো।

নিত্য নতুন কার্যক্রম নতুন নতুন চিন্তার গবেষণা শুরু হলো স্কুলে। সুঁকান্তের 'অভিযান' গীতিনাট্যের সুর দেওয়ালেন আজীজ খান। 'তাসের দেশ' এর রিহারর্সাল শুরু করেন। মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' হতে অংশ বিশেষ নিয়ে আট/দশটি গানে সুরকরালে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। স্কুলের সারা বছরের কার্যক্রম নিয়ে 'ফসল' ছাপালেন তা ছোটদের ছড়ার গানের স্বরলিপি 'গঙ্গা ফড়িং' প্রকাশ করলেন। দ্বিমাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা 'স্বরলিপি' প্রকাশ করলেন বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে।

স্কুলে পূর্ণিমা সম্মেলন শুরু হলো। পূর্ণিমা সম্মেলনে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের অগ্রগতি দেখানো হতো— কবিতা প্রবন্ধ ছোটগল্প পাঠের আসর বসতো এবং এসব পরিকল্পনার মূলেই ছিল আজীজ খান।

স্কুল অব মিউজিককে অনেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্থা বলে মনে করতো। আজীজ খানের অমতে কিছু হতোনা বলেই অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু সহকর্ম্মীদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে আমি দেখিনি কোনদিন। সাতজন সম্পাদকের ক্ষমতা ছিল সমান। যে কেউ যেকোন চেয়ারে বসতে পারতো। সভাপতি বা সম্পাদকের নির্দিষ্ট চেয়ার

কোনদিনই ছিল না। সবাইকে দিয়ে কাজ করানোর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল আজীজ খানের। রাতারাতি লেখক, গায়ক ও কর্মীগঠন করার দক্ষতা ছিল তাঁর। একটু উৎসাহ দেখলেই পত্রিকার সম্পাদক হোক, স্কুলের সম্পাদকই হোক আর সঙ্গীতের শিক্ষককেই হোক, বানাতে দ্বিধা করতেন না মোটেই। আবার নিরুৎসাহ দেখলে লাল কালি দিয়ে নাম কাটতেও জুড়ি ছিল না তাঁর—সে যতই পরিচিত বা আত্মীয় হোকনা কেন। তাই স্কুল অব মিউজিক কে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্থা বলে ভুল করতো সবাই। কিন্তু আসলে সহকর্মীদের সঙ্গে সাধারণ বিষয়েও আলোচনা করতেন সব সময়। আর সত্যি বলতে কি তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে যেয়েতো প্রমাণ করেছেন যে স্কুল অব মিউজিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্থা ছিলো না।

সঙ্গীত প্রশিক্ষণেও তিনি আমূল পরিবর্তন এনেছেন স্কুলে। সে সময়েই তার পরিকল্পনা ছিল পুরানো প্রথা বাদ দিয়ে কিভাবে অল্প সময়ে কম কষ্টে ছাত্র ছাত্রীদের তৈরী করা যায় এবং কত বেশী মানুষকে সংগীতে আকৃষ্ট করা যায়। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগীত ছড়াতে তাই পাশাপাশি দুই প্রথায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন স্কুলে। সফলও হয়েছেন নতুন প্রথায়। অল্প সময়ে অনেক ছাত্র ছাত্রীর গুণগত মান বেড়েছে প্রচুর যা বিশ বছরেও নামী দামী শিক্ষকেরা করতে পারেননি। ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কথা চিন্তা করে তথাকথিত শিক্ষকরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু আমল দেননি আজীজ খান। এক এক করে অসৎ শিক্ষকদের মুখোশ খুলছেন এবং ঝেঁটিয়ে বের করেছেন। স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এখন পাঁচ শতের উপর। বহু কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী আছে স্কুলের। সবাইকে এখন একটা গোষ্ঠী বলে মনে হয়। আমাদের সবারই চিন্তা কিভাবে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় স্কুলকে, যদিও আজীজ খানের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, অনুশীলন, প্রতিপাদন অনেকেই বোঝেন না। আজীজ খান বেঁচে থাকতে সত্যিই আমি উপলব্ধি করতে পারিনি যে স্কুল অব মিউজিক সবার মনে এ ভাবে দাগ কেটেছে।

সত্যি কথা মুখের উপর বলতে আজীজ খান দ্বিধা করতেন না তাই স্কুল অব মিউজিকের বিরুদ্ধাচরণ করতে লোকের অভাব ছিল না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা বা লোভকে চিরদিনই ঘৃণা করে এসেছিলেন তিনি। অনেক জ্ঞানী গুণী লোক এসেছেন নিজের স্বার্থ হাছিল করতে কিন্তু তেমনি ফিরে গিয়েছেন সুযোগ না পেয়ে।

শেষ দিকে আজীজ খান জ্বর নিয়েই স্কুলে আসতেন--তবে আমরা আমলই দিতাম না কারণ অসুখ তাঁর আমি কোনদিন দেখেনি, আর দেখেও কিছু বোঝা যেতনা। ডাক্তারদের উপর তার একটা বিরূপ ধারণা ছিল বরাবর। তাই শেষ পর্যন্ত যখন সেই সব ডাক্তারদের উপরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্ভর করলেন তখন মনে মনে শঙ্কিত হয়েছিলাম বইকি। একদিন কথায় কথায় মনোগত দুর্বলতার কথা বললে প্রতিবাদ করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু আমি জানতাম তাঁর নিজের উপরে সে আস্থা আর ছিলনা।

অনেক পীড়াপীড়িতে ঢাকা গিয়েছিলেন কিন্তু সবার অবহেলায় ক্ষুব্ধ হয়ে চিকিৎসা না

করিয়ে ফিরে এসেছিলেন এবং দুঃখ করে বলেছিলেন 'বিজ্ঞানের এই জয় যাত্রার দিনে কি ভাবে বিনা চিকিৎসায় এবং অবহেলায় লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে'।

সবশেষে স্কুলে তিনি এসেছিলেন ১লা বৈশাখের সকালে। শিক্ষক কর্মী ও ছাত্র ছাত্রীরা সবাই উপস্থিত, কিন্তু আজীজ খান আসেননি। খবর এলো শরীর বেশী খারাপ তাই আসতে পারবেননা। আজীজ খান ছাড়া ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠান শুরুকরতে পারিনা, তাই লোক পাঠালাম আনতে। জ্বর নিয়ে আসলেন।

১লা বৈশাখের সন্ধ্যায় আজীজ খানের ইচ্ছায় একটি রবীন্দ্রসংগীত ক্যারল শ্রোতাদের উপহার দিয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। খুলনা বা বাংলাদেশের কোথাও এ ধরণের গান পরিবেশন করা হযনি এর আগে ছাত্র ছাত্রীদের এই সাফল্য তিনি শুনেছিলেন শুয়ে শুয়ে—অদ্ভুত আনন্দের প্রকাশ দেখেছিলাম তার মুখে সেদিন। অবশ্য রিহার্সাল তিনি শুনেছিলেন এবং খুশী হয়ে একশো টাকা মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন ছাত্র ছাত্রীদের। কিন্তু আমরা কেউ ধারণাই করতে পারিনি যে আজীজ খানের এই হবে শেষ স্কুলে আসা।

অনেক পীড়াপীড়িতে আমাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য কোলকাতা যেতে তিনি রাজী হয়েছিলেন। আমাকে নিয়ে যাবেন শুনে আশ্চর্য হয়ে ছিলাম কারণ স্কুলের ক্ষতি হবে বলে কোনদিনই আমকে কোথাও নিয়ে যেতেন না। যাইহোক শেষ পর্যন্ত যাওয়ার আর দরকার হলো না।

(আশ্বিন ১৯৮২)

ব্যক্তিগত পরিচয়ের আলোকে আজীজ খান

ডাঃ এম. এ. মানাফ

সেটা ১৯৫২ সালের কথা। ফরিদপুর গিয়েছিলাম এক আত্মীয়বাড়ী বেড়াতে। সেখানেই হাতে এল এক কপি 'ইশারা' পত্রিকা। পত্রিকাটি যশোরের মত মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত। শুনতে পেলাম ঐ পত্রিকাটির গ্রাহক সংগ্রহের জন্য মিসেস হামিদা বেগম ও তার ভাই আজীজ খান এসেছিলেন শহরে। সেই প্রথম আজীজ খানের সাথে সাক্ষাত না হলেও পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর পরিচয়। নিতান্ত সাহিত্যের ভূত ঘাড়ে না চাপলে কেউ ঘরের খেয়ে খুলনা যশোর ফরিদপুর দৌড়া-দৌড়ি করেনা। আর এসব পত্রিকা চালাতে যে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয় সেটা বলাই বাহুল্য।

তার প্রায় একযুগ পরে যখন খুলনায় জীবিকার তাগিদে স্থায়ীভাবে বসেছি তখন তাঁর সাথে ভাল করে মিশবার সুযোগ পেলাম। ফরসা, নাতিদীর্ঘ গড়ন, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, না-চপল না-গম্ভীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ নিয়ে এ লোকটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচয় অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌঁছায়। দু একদিন মেলা মেশার পরেই প্রস্তাব করলেন শুধু গল্পগুজব না করে প্রতি সপ্তাহে কোন এক সন্ধ্যায় একটা করে ঘরোয়া সাহিত্যের আসর বসালে কেমন হয়? তাতে যে যা পারে লিখে এনে পড়বে। সবার সানন্দ সম্মতি ক্রমে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের অফিসার আমানুল্লাহ সাহেবের সাউথ সেন্ট্রাল রোডের বাসায় প্রথম বৈঠক বসে। স্বাভাবিক ভাবেই আজীজ খানকে সভাপতি করে আসর শুরু হয়। আমানুল্লাহ, মিজানুর রহিম, আমি এবং আরও দু একজন এতে সামিল হয়েছিলাম। প্রত্যেকে তাঁর নিজের নিজের রচনা পড়া শেষ করলে তার গঠন মূলক সমালোচনা করে খান সাহেব তার সভা শেষ করেন। কি লিখেছিলাম আমরা, আর তার দাম আদৌ আছে কিনা জানিনা, কিন্তু পরে জেনেছি এইভাবেই অনেককে লেখার অভ্যাস করিয়ে পরবর্তী জীবনে সাহিত্যিক হবার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। এরপর আরও দু একটা আসর বসে। আমি সাহিত্যিক নই—সাহিত্যরসিক মাত্র। কিছুটা সে কারণে এবং কিছুটা জীবিকা ও এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় এ আসর থেকে আমি ক্রমেই দূরে সরে যাই। কিন্তু মাঝে মাঝে সাউথ সেন্ট্রাল রোডের সেই কালো রংয়ের বাড়ীটায় তার পড়ার ঘর অথচ বৈঠক খানায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। হয় পড়া, না

হয় লেখা কিংবা সঙ্গীতের অনুশীলনে রত খান সাহেবের সে পরিচয় ভুলবার নয়। নাটক ও নৃত্যনাট্যের মহলায়ও ব্যস্ত থাকতে তাকে দেখেছি। মাঝে মাঝে কাগজে তার লেখা পড়ে আনন্দ পাই।

তারপর ছয় সাত বছর আমার কর্মব্যস্ততার জন্য খান সাহেবের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ময়লাপোতার বাড়ী তৈয়ারী তদারক করা, আওয়াজ কাগজের সাথে সংযুক্ত থেকে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নেওয়া আর তার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য ও সংগীতের চর্চার সে ইতিহাস তার অন্য কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে থেকে আমরা শোনবার আশা রাখি। ১৯৭১ সালে পাক মিলিটারী কেনই বা তাকে ধরে যশোর ক্যান্টনমেন্টে আটকে রাখে এবং কি নির্যাতন তাঁর উপর চালানো হয়েছিল সেটা এখনো আমাদের অজ্ঞাত।

১৯৭২ সালে পঞ্চবীথির মোড়ের দোতালায় একটা নতুন ও অপরূপ সাইন বোর্ড অন্য সকলের মত আমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সংস্কৃতির এই বন্ধ্যাত্বের আমলে সবাইকে নিয়ে তিনি সঙ্গীতের এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন। এবং পরবর্তী বছর থেকে অনিয়মিত স্বরলিপি নামক সাহিত্য পত্র বের করে সংস্কৃতির অন্য শাখায় তার অবদান রাখছেন। তারপর যখন স্বরলিপি ঋতুভিত্তিক দ্বি-মাসিক পত্রিকারূপে আত্ম প্রকাশ করল তখন শত কাজ থাকা সত্বেও সময় করলাম সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিন স্কুল অব মিউজিকের আসরে হাজিরা দিতে। অবশ্যই সেটা বিফলে যায়নি।

গত বছরের পূর্ণিমা সম্মেলনের কথা মনে পড়ছে। স্কুলের ছাদে খোলা আকাশের নীচে প্রত্যেক পূর্ণিমায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠের এ আসর অভিনব ও অপরিহার্য। নিজে সাহিত্য চর্চা করে এবং অপরকে লেখার তাগিদ ও উৎসাহ দিয়ে সাহিত্যাঙ্গনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা খান সাহেবের এক অনন্য কীর্তি। বর্তমানের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর এ ভূমিকার কথা নিশ্চিয়ই ভুলতে পারবেন না।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পুরানো ধারা বদল করে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কথা তাঁর সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে শুনেছি। নতুন ও সম্ভাবনাময় সাহিত্যিকদের নিয়ে একটা সম্মেলন করবার তোড়জোড় ও চলছিল। খান সাহেব থাকলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এটা বাস্তবে রূপ পেত। স্বরলিপিকে মাসিকে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা তো দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকেই শুরু হয়েছিল। এখন এর অস্তিত্ব বিলীন।

তার সবচেয়ে বড় অবদান স্কুল অব মিউজিকের জন্য পৌরসভার কাছ থেকে এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করে তাতে স্কুলের নিজস্ব বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু করা। জানিনা এটা শেষ হবে কিনা, কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে ময়লা পোতার সেই নির্মীয়মান বাড়ীর কাছে একটা টুলে বসে কাজের তদারক করতে খান সাহেবকে আর আমরা দেখতে পাব না।

আমরা শোক প্রকাশ করতে পারি, প্রস্তাব পাশ করতে পারি, গুণকীর্তন করতে পারি, কালের অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী একদিন আমরা এসব ভুলেও যাব, কিন্তু তাতে কি খান সাহেবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানানো হবে, যতক্ষণ না তার আরব্ধ কাজ

আমরা শেষ করি? তার সারা জীবনের আশা ও অন্তিম ইচ্ছানুসারে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রয়োজনেও বটে, এ স্কুল বাড়ীকে গড়ে তুলতে হবে। স্কুলকে চালু রাখতে হবে। স্বরলিপিকে বাঁচাতে হবে। তাঁর সহ কর্মীরা কেউ অযোগ্য নন। কাণ্ডারীর অভাব যদি পূরণ না হয় তবে কি ধরে নিতে হবে যে মাত্র একজনের অবর্তমানে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাবে? প্রয়োজন হলে কালেকটিভ লীডারশীপের মাধ্যমে কাজ করে এ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে হবে– পত্রিকা প্রকাশ করে যেতে হবে। দেশের এই দুর্দিনে এই দিকটার অধঃপতনে নীরব দর্শক হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন মূর্তি বা ছবি টানানোর প্রয়োজন হবে না, রাস্তারও নামকরণ করা লাগবে না, স্কুল অব মিউজিকই হবে আজীজ খানের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি সৌধ।

সুরস্রষ্টা সাধন সরকার

কালিপদ দাস

কৈশোরে পাঠ্যসূচী "রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা"র সাথে নজরুল, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, বিদ্যাসাগর সহ "কলকি অবতার কে?"বইটি পড়ি। শেষোক্ত বইটির লেখক তথাকথিত মালাউন (মালাউন শব্দটির শ্রুত প্রয়োগ)। এতে যুক্তি গ্রাহ্য বিশ্লেষন কলিযুগের ঈশ্বর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। উল্লেখিত মনিষী - মহামনিষী আমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে বহুল পঠিত, আলোচিত ও ব্যাখাত ব্যক্তিত্ব। এখন যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ চোথা প্রাপ্ত বিশেষ বা অতিবিশেষ লেবাসধারীদের; রবিঠাকুরের পুত্র কন্যা, প্রমিলা নজরুলের পিতৃদেব বা মহানবী কর্তৃক বিধর্মীদের মসজিদে প্রার্থনার অনুমতি প্রসংগে প্রশ্ন করে ৯০% ভাগে নীরবতা দেখেন; তবে তো আমাহেন অভাজনের কাছে জীবনালখ্য রচনার স্বার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন এসে পড়ে। প্রসঙ্গত, আমার মত খুতখুতের জন্য কিন্তু লেখকের (লেখা Manufatcure বাদে) লেখনী নির্লিপ্ত থাকে না। লেখকের সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকে। আমি লেখক নই বিধায় ,ও বালাই নেই। শুধূ ঋণের ভার বিয়োজনের তাগিদেই সাধন সরকারের প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা নিষিক্ত যৎ কিঞ্চিত স্মৃতি তর্পণের প্রচেষ্ট।

প্রয়াত সাধন সরকার বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তার মধ্যে তাঁর সুরসৃজনী সত্তাটাই এখানে আলোচিত হয়েছে।

কন্ঠের সম্পদে এবং সুরের মিষ্টত্বেও তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশনে স্বরের নিম্ন সপ্তকের ব্যবহার এ উপমহাদেশের দুজন প্রথিতযশা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর কথা মনে করিয়ে দেয়- যাঁরা হচ্ছেন স্বর্গত পঙ্কজ কুমার মল্লিক ও দেবব্রত বিশ্বাস। রাগ সংগীতের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর গান শৈলীর উৎকর্ষতা, তাল কর্তন, Staccato ধর্মে স্বর প্রক্ষেপন, বোল তাল বাঁট সংযোজনায় নব নব উদ্ভাবনী ইত্যাদিও উল্লেখ করবার মত। এ ক্ষেত্রটিতে আমাদের দেশের রাগ শিল্পীদের কাতারের পুরোভাগে রাখা যেতে পারে সমকালীন প্রেক্ষাপটে।

বলা বাহুল্য, সাধারণতঃ গম্ভীর ভারী গলার গায়কের (দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সুক্ষ্ম সুরালাঙ্কারের ক্ষেত্রে যে ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার সেটা কিছুটা কম থাকে, যেটা তারও কিছুটা কম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুনাদ সমৃদ্ধ স্বরের ঐশ্বর্য্যে তিনি দিক নির্দেশক কণ্ঠ শিল্পী। কাজেই তাঁকে শুধুমাত্র গায়ক বললে কম বলা হয়। বলা উচিত তিনি স্রষ্টা, তিনি কণ্ঠস্বরের আশ্রয়ে সুরের যাদুকর। তিনি গায়ন শৈলী ও সুর যোজনা উভয়বিধ ক্ষেত্রেই স্রষ্টা এবং এই নিরিখেই শিরোনামে সুরস্রষ্টা কথাটি বিচার্য।

গায়ন বা সুর সংযোজন করলেই কেউ স্রষ্টা হয় না। এমনকি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, নাম ধাম প্রচুর, যথেষ্ঠ সুরারোপিত গানের কলি শোনা গেলেও না। কেননা এ ক্ষেত্রে যদি শিক্ষালব্ধ গানের কেবল পুনঃ প্রকাশ বা অনুকরণাত্মক সুরের সংযোজন হয় সেখানে সৃষ্টির লক্ষণ কোথায়? সাংগীতিক পরিমন্ডলে স্রষ্টার তিনটি অর্গল খোলা রাখতে হয়। প্রথমটি ওস্তাদের কাছ থেকে পাওয়া, দ্বিতীয়টি অনুনাদ সমৃদ্ধ স্বকীয় কণ্ঠসুরের বিশেষত্ব এবং তৃতীয়টি হোল স্রষ্টা গায়ক বা স্রষ্টা সুরকারের স্বীয় প্রতিভার বলে সুরের অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি হবে- যেখানে সংগীত আবহে সুরের মধু বর্ষিত হবে এবং শ্রোতা ও শিল্পীর মধ্যে তাৎক্ষণিক একটি আত্মিক প্রাণময় সংযোগ ঘটে যাবে। এখানে এই অর্থেই সাধন সরকার স্রষ্টা গায়ক এবং স্রষ্টা সুর সংযোজক।

সম্ভবতঃ বিশের দশকে বিত্ত বৈভব কৌলিন্যহীন সাধন সরকারের পিতৃদেব কেশবচন্দ্র দে সরকার আদি নিবাস তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার দাশোরা গ্রাম থেকে খুলনা এলেন সরকারী চাকুরীর প্রয়োজনে। তিনি খুলনা জজকোর্টের একজন সেরেস্তাদার ছিলেন। আর দশজনের মতোই প্রথমে আসক্তি পরে ভালবাসার তাগিদেই শেষ পর্য্যন্ত খুলনাতেই স্থায়ী বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই মোতাবেক মির্জাপুর সড়কে দুই কামরা বিশিষ্ট একটি পাকাবাড়ী নির্মাণ ক'রে স্ত্রী সুখদা সুন্দরীকে নিয়ে সুখ-স্বচ্ছলতার মধ্যে সাংসারিক জীবন-যাপন করতে থাকেন। ইতোমধ্যে ১৩৩৬ সনের ২৮ পৌষ সুখদা সুন্দরীর কোল আলোকিত করে সাধন সরকার পৃথিবীতে এলেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল বিনয় কুমার দে সরকার। কিন্তু ওস্তাদ বিনয় কুমার রায়-এর নামের সাথে মিল থাকাতে ও নামটি ধীরে ধীরে নির্বাসনে গেল ইচ্ছাকৃত ভাবে। যাহোক, মাত্র ৬ বছর বয়সেই সাধন সরকারের পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতা বাল্য বিধবা সুখদা সুন্দরী একমাত্র শিশু সন্তান সাধন সরকারকে নিয়ে বসত বাড়ীর একটি কামরা ভাড়া দিয়ে এক রকম দৈন্যতার মাঝ দিয়েই জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। সুখদা সুন্দরী ছিলেন ধর্মপরায়ণা বিদুষী মহিলা। সময় চলতে থাকে তার নিজস্ব লয়ে এবং সময়ের সিঁড়ি বেয়েই সাধন সরকার একদিন স্থানীয় বি.কে. ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে বেরিয়ে আসেন। মায়ের ইচ্ছা ছিল দারিদ্রের বাঁধন যত শক্তই হোক না কেন, পুত্রকে তিনি উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন এবং এমন একদিন আসবে যখন ছেলে খুব বড় চাকরী করবে, সংসারের অভাব-অনটন দূর হবে, আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। কিন্তু মানুষ চাইলেই তো আর সব হয়না। আকৈশোর মায়ের প্রার্থনা সংগীতের রসে নিষিক্ত

আপ্লুত-সঞ্জীবিত যে মন তাই কিনা অর্থের নিগড়ে বাঁধা পড়তে পারে? সুরের পাখী তো সুরের আকাশে ডানা মেলে উড়তে চাইবে। অতএব তাঁর সুরের জগতেই মনোনিবেশ ঘট্‌লো। এমনকি ম্যাট্রিক পাশের পর স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসের চাকরীটিও তাঁকে ৬ মাসের বেশী বেঁধে রাখতে পারলো না। সংগীতের তালিম নিলেন যথাক্রমে ওস্তাদ শামসুদ্দীন আহ্‌মেদ, কিশোরী বাবু (বাঁশী), বি,এল কলেজের সুকুমার মিত্র, কালিপদ চক্রবর্ত্তী, ওস্তাদ মুন্সী রইস উদ্দীন প্রমুখ গুণীজনের কাছ থেকে এবং শুধুমাত্র সংগীতকেই পেশা এবং নেশা হিসেবে আঁকড়ে ধরে প্রায় মানবেতর জীবনযাপন করে ১৯৯২ সালে ১৫ই জুন চিকিৎসাধীন অবস্থাতে ঢাকাতে দেহ রক্ষা করলেন, বলতে গেলে খানিকটা অকালে - অগণিত গুণগ্রাহী ভক্ত শিষ্যদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে রেখে।

শিল্পী এবং সুরকার হিসেবে সাধন সরকারের আত্মপ্রকাশ পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে। সে সময়টা সংগীত জগতের-যুগসন্ধিক্ষণ। ১৯৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষত তখনও ঠিকমত শুকায়নি। এ রকম একটা সময়ে খুলনা সাংস্কৃতিক মজলিস এর সাম্প্রদায়িক বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে নয়া সংস্কৃতি সংসদে অভিনেতা ও সুরকার হিসেবে যোগদান করেন। তখন ওই সংগঠনটির কর্ণধার ছিলেন পলীমঙ্গলের বন্ধুবর গফুর সাহেব এবং আমিও সেখানে সদস্য হিসেবে ছিলাম। তারপর একে একে অগ্রণী সংসদ, পারাবত, সন্দীপন, সুর বিতান (দৌলতপুর), স্কুল অব মিউজিক, খুলনা জেলা সংগীত শিল্পী সংস্থা, গণশিল্পী সংস্থা, জাতীয় রবীন্দ্র সংগীত সম্মিলন পরিষদ ইত্যাদি বহু সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে কাজ করেছেন। বলা বাহুল্য, এর প্রত্যেকটি সংগঠনে একত্রে কাজ করার সৌভাগ্য এবং নিকট সান্নিধ্য লাভ আমার ঘটেছে। কাজেই এদিক থেকে মনে করি আমি অনেকের চাইতে সৌভাগ্যবান। তবে দুঃর্ভাগ্যের বোঝাও কম বইতে হচ্ছে না। কেননা, যা তাঁর কাছ থেকে নেবার ছিল এবং যা দেবার ছিল তার কোনটাই পুরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি শুধু তাঁর সৃজনী প্রতিভার দু'একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবো।

পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়টাতেই তিনি মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের সংগীতে সুর সংযোজনা করে গেছেন। তাঁর সুরারোপিত গানের সঠিক সংখ্যা যে কত হবে তা বলা কঠিন। তবে আমার ধারণা হাজারেরও কিছু বেশী হবে। যেসব শ্রেনী ভুক্ত গানে তিনি সুর দিয়েছেন, সেগুলি হলো— মোটামুটি ভাবে, আধুনিক বা কাব্য সংগীত, গণ সংগীত, দেশের গান, একুশের গান, রাগ প্রধান, লোকগীতি, ছড়াগান, সুকান্তের কবিতা, কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের কবিতা, মাইকেল মধুসূদনের কবিতা, চর্যাপদ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, সংখ্যাটি এখানে খুব বড় কিছু নয়; কেননা সংখ্যাল্পতা বা সংখ্যাধিক্যতার উপর কিন্তু মৌলিক সৃষ্টি মূল্যায়ন নির্ভরশীল নয়।

সাধন সরকারের সংগীত জগতে আবির্ভাব যুগ সন্ধিক্ষণে। তখন সমকালীন বাংলাগানে (আধুনিক গান) উপমহাদেশ মাতিয়ে রেখেছে হিমাংশু দত্ত, শৈলেন দত্ত,

শচীন দেব বর্মন, কমল দাশ গুপ্ত, অনুপম ঘটক প্রমুখ প্রতিথযশা সুরকারবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ ও কাজী নজরুল। এই পঞ্চ প্রধান বাংলা গান রচয়িতা- শিল্পীর পর আধুনিক বাংলাগানের গীতিকার হিসেবে তখন অজয় ভট্টচার্য্য, সুবোধ পুরোকায়স্থ, শৈলেন রায় এবং কিছু পরে গৌরীপ্রসন্ন, মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্ত প্রমুখ গীতিকার বৃন্দের গানে উপরুক্ত সুরকারদের সুরে উপ-মহাদেশ টইটম্বুর। অন্যদিকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে বাংলা গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর তখন আকাল পড়েছে। তখনকার দিনে এ দেশের সংগীত জগতে প্রচন্ড রকম ভাটার টান। অথচ দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ করে সংগীত আসরের তখনকার দিনের যারা শ্রোতা-দর্শক, তাঁদের শ্রবণেন্দ্রিয় খুবই তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধার সম্পন্ন। কেননা উল্লিখিত গীতিকার সুরকার এবং সাথে শচিনদেব বর্মন, জগন্ময় মিত্র, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, সুর সাগর হিমাংশু দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টচার্য্য, শৈল দেবী, পান্নালাল ভট্টচার্য্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সত্য চৌধুরী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু প্রমুখ কণ্ঠশিল্পী যাঁরা আধুনিক নামধেয় বাংলাগানকে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে ও বৈচিত্রে সরস সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। এঁদের গানের নিষিক্ত রসাস্বাদনের মধ্য দিয়েই শ্রবণেন্দ্রিয়কে শানিত করে রেখেছেন। কাজেই যেনতেন ভাবে হাল্কা সহজিয়া চালের, সুরের স্বরণি থেকে বিচ্যুত যন্ত্রের তারস্বর কোলাহলে সুরকে ডুবিয়ে রাখা গানের সুর দর্শক শ্রোতার মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিতে পারতো না। অপরপক্ষে বাংলা আধুনিক গানের তৃষ্ণা মনে থাকা সত্ত্বেও, দ্বিজাতিতত্বের উত্তরাধিকার হেতু, সরাসরি ভারতীয় বাংলা আধুনিক গান ভিন দেশীয় সংস্কৃতির বাহক হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে অনেকটা অছ্যুৎ অবস্থায় তথা কথিত প্রগতিবাদী ও দেশ হিতৈষীদের কাছ থেকে দূরে রয়ে গেল। অথচ এপার বাংলায় তখন পর্যন্ত আধুনিক বাংলা গানের যথেষ্ট চাহিদা সত্ত্বেও এই গানের ধারাটি কেবলমাত্র আতুড় ঘরে। এমন কি উল্লেখযোগ্য কোন গীতিকার সুরকার শিল্পীরও আবির্ভাব ঘটেনি। ওই সময়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রিক কিছু আধুনিক গান স্বল্পায়ু নিয়ে মাঝে মধ্যে শ্রোতাদের কাছে ধরা দিত বটে তবে তা উল্লেখযোগ্য কিছু না। সে সময়ে দেশে হাতে গোনা ২/১ জন সুরকারের মধ্যে উল্লেখ করার মতো ছিলেন মরহুম আব্দুল আহাদ, বেদারউদ্দীন আহমেদ, আব্দুল লতিফ প্রমুখ সুরকারবৃন্দ এবং মহম্মদ হোসেন খসরু ও কিছু কিছু আধুনিক গানের সুর করতেন। যদিও তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন। এখানে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে তখন গানের কোন ডিস্ক হোত না। আধুনিক গান বলতে আমাদের সম্বল ছিল গুটি কয়েক সিনেমা সংগীত।

এ রকম এক মহাশূন্যতার মধ্যে সাধন সরকারের আত্মপ্রকাশ। শহরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আধুনিক গানের প্রচুর চাহিদার সাথে সাধন সরকারের চাহিদা বেড়েছে। অথচ ভারতীয় গান জাত খুইয়ে বসে আছে। এ অবস্থা থেকেই তিনি আধুনিক গানের সুর যোজনার ক্ষেত্রে হাত বাড়ালেন। তিনি যে সমস্ত গীতিকারের

গানে সুর দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এম,এ রমজান, মোতাহার হোসেন, আবুল বাশার, উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরি হাজরা, টুটুল চৌধুরী, ফিরোজা বেগম, মির্জা শরফুল হোসেন, নগেন দাস, আবু-বকর সিদ্দিক, নাজিম মাহ্‌মুদ, সুশান্ত সরকার, অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক প্রমুখ গীতিকারবৃন্দ। সেই ৫০-এর দশকের শুরু থেকে শেষ অবধি তিনি যেন তাঁর অভিনব সুর বৈচিত্রের সংযোজন ঘটিয়ে সৃষ্টিশীলতার এক নয়া দিগন্তের দিক নির্দেশনা দিলেন আমাদের। তখনকার খুলনাতে সাধন সরকার বিহীন কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কল্পনাই করা যেত না। আর সব অনুষ্ঠানেই সাধন সরকারের গান প্রাধান্য পেত। এমনকি গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে কিছু কিছু ওপার বাংলার গানের মতই শ্রোতার সমধিক হৃদয় স্পর্শ করতো। তাঁর ওই সময়কার সুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এ দেশীয় আধুনিক গানে নবতর মাত্রা সংযোজনের দাবি রাখে বলে আমি মনে করি।

আধুনিক বাংলা গানে দৃশ্যতঃ কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা সংগম স্থাপিত হবেই। কথা ও সুরে মিলে এই গানে এমন একটি সুসামঞ্জস্য রূপ-রস উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়-যেটা রাগসংগীতের মধ্যে সুলভ্য ও সুলক্ষ নয়। আধুনিক বাংলা গানে অবশ্য একটি অনুলেখ্য অথচ মুখ্য বিচার্য বিষয়, এর কথা ও সুরের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব। এ বিষয়টি শুরুতেই সারাক্ষণ মাথায় রেখেই তিনি আধুনিক গানে সুর যোজনা আরম্ভ করেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার যে প্রথম দিকের সুর যোজনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি কিছুটা রবীন্দ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং সঙ্গত কারণেই কিছু গানে ভারতীয় সংগীতের চিরাচরিত ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই সুর বিন্যাসের চেষ্টা নিয়েছেন। এ জাতীয় গানে ভারতীয় মূল সংগীতের আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় সুরের ঋজুবদ্ধ আদর্শের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এ ধরণের দু'একটি গানের এখানে উল্লেখ করছি যেমনঃ স্বপন ভরা শ্রাবণ রাতে। এম,এ রমজান/বালুচরে বাসা বেঁধে মিছেরে স্বপন কিংবা কবরী সাজালে কেন কনক চাঁপাতে-উৎপল বন্দোপাধ্যায়। অন্যদিকে রাবীন্দ্রিক প্রভাবমুক্ত শারদ প্রভাতে শেফালিকা সম নয়নে শিশির ঝরে— মোতাহার হোসেন (গানটি গেয়ে লেখক খুলনা জেলাতে ১৯৫৩ সনে ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত)/ব্যাকুল পৃথিবী মানুষের ভীড়ে-এম,এ,রমজান/নাইবা এলে এই ফাগুনে-উৎপল বন্দোপাধ্যায়। তবে বলা দরকার যে তাঁর সুরারোপিত আধুনিক বাংলা গানগুলির বাণীর উৎকর্ষতা কোন অবস্থাতেই সুরকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি এবং এই খানেই তাঁর সুর সংযোজনার স্বার্থক সৃষ্টি।

এর পরে অর্থাৎ পঞ্চাশ দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি যে সব আধুনিক গানের সুর করেছেন সেখানে তো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বল্‌তে হয়, সুরের মুক্তি। সে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে সুরকে তার সংগীত কৌলিন্য থেকে ভ্রষ্ট করা হয়েছে এবং বাণীকে সুরের প্রভাবে আক্ষেপ করতে হয়েছে। এ জাতীয় গানে সুরকে লোকায়ত করার মানসে নতুন রূপে রূপায়িত করা হয়েছে। এর ২/১টি নমুনা, জীবনটা রয়ে যাবে অচেনা-মির্জা শরফুল হোসেন/আকাশটা চিরদিন রবে কি-টুটুল

চৌধুরী/ নদী তুমি বলেছিলে গান শোনাবে– নগেন দাস ও কাজল কালো বরণ হরিণ চোখে ইত্যাদি আরও বহুগান যা এই মুহূর্তে বিস্মৃতির অতলে।

এরপর ষাটের দশক তো সাধন সরকারের সুর সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য সময়। এ দশকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি গণসংগীত ও একুশের গানে সুরসংযোজনা। এসব গানের গীতিকার হিসেবে পাই আমরা নাজিম মাহমুদ, আবু বকর সিদ্দিক এবং কিছু পরে সুশান্ত সরকার ও অচিন্ত্য কুমার ভৌমিককে। ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব যার মধ্যে ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের আবহে নূতন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ঠিক এমনি এক সময়ে ২৮/৯/৬৩ তারিখে শামসুর রহমান সড়কে সন্দীপন নামে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়। এখানে খুলনার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভাব বিনিময়ের আসর বসত যার অংশীদার এবং প্রত্যক্ষ কর্ম তৎপরতার নায়ক হিসেবে নিয়মিত সান্ধ্যকালীন আসর সরগরম করে রাখতেন নাজিম মাহমুদ, হাসান আজিজুল হক, বিদ্যুৎ কান্তি সরকার, শহীদ অধ্যাপক খালেদ রশীদ (গুরু), মমিনুল ইসলাম বাচ্চু, মরহুম অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, নাজিম সেলিম, আইনুল ইসলাম, জহর রায়, গুলজার হোসেন (বরিশাল), গৌরি শঙ্কর ঘোষ এবং সাধন সরকার প্রমুখ গুণীজন। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মরহুম আব্দুল হাকিম (১৯৫৪ যুক্ত ফ্রন্টের আমলের স্পীকার)। প্রাসঙ্গিকতার খাতিরেই সন্দীপনের ইতিবৃত্ত প্রলম্বিত করা হোল এ কারণে যে সমসাময়িক প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের আখড়া হিসেবে খুলনাতে তখন এই একটি মাত্র সংগঠনই ছিল। বাকী যা দু'একটি ছিল সেখানে শুধু দরবারি কায়দায় চিত্তবিনোদন মূলক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের চর্চা চলতো। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে সাধন সরকারের গণ সংগীতের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি তা হোল এই সন্দীপন।

সাধন সরকারের গণসংগীতে সুরযোজনা আলোচনার প্রাক্কালে গণসংগীতের উপর একটু আলোকপাত করা দরকার মনে করি। গণসংগীতের জন্ম মূলতঃ ১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগের সামান্য কিছুকাল আগে থেকেই একেবারে নাগরিক আবহাওয়ার মধ্যে। এর প্রকাশ শৈলীতে কিছুটা মার্জিত শিল্পকর্মের ছাপ পাওয়া যায়। এর আগের দিনে কোরাস গানের যে প্রচলন ছিল সেগুলি বস্তুতঃ দেশপ্রেমের ভাবাদর্শে রচিত সম্মেলক গানের পর্যায়ভুক্ত; যার মধ্যে পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার কামনা, জাত্যাভিমান, ঐক্য ও সংহতির আহ্বান, দেশের ঐতিহ্যের গৌরব বা নৈসর্গের চিত্রায়ন কিংবা মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা ইত্যাদি। রবীন্দ্র–দ্বিজেন্দ্র–রজনী–অতুল–মুকুন্দ এবং নজরুল ইসলাম—এঁদের সকলেরই কোরাস গানের মূল ভাব কিন্তু উল্লিখিত ভাবের কোন না কোন একটি বা একাধিক ভাবাশ্রয়ী।

অপরদিকে গণসংগীতের ভাবের মূলভিত্তি হলো সমাজতান্ত্রিক চিন্তাদর্শের নিগড়ে বাঁধা; যা কিনা স্বদেশীয়তার আদর্শ থেকে কয়েক ধাপ আগের কাতারে। বিবর্তনের কিছু সিঁড়ি না ডেঙানোর পর জাতীয়তা সমাজতান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হতে পারে না। পরাধীনতা থেকে দেশ মুক্ত হলে কিংবা মুক্তি পাবার ইঙ্গিত পাওয়ার পরই কেবল

সমাজতন্ত্রের দিকে চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটতে পারে। কেননা আগে জাতীয় মুক্তি পরে ধনী নির্ধনের বৈষম্যের অবসান।

তবে একথা ঠিক যে গণসংগীতের যাত্রা শুরু কিন্তু নজরুল ইসলাম এবং মুকুন্দ দাসের মধ্যে দিয়েই। যার উপর পরবর্তী কালের গণসংগীত দাঁড়াবার জমিন খুঁজে পায়। তবে উল্লিখিত দুয়ের মধ্যে কিছু ভাবগত পার্থক্য ছিল। নজরুল ইসলামের চাষীর গান, শ্রমিকের গান, নওজোয়ানের গান কিংবা অন্তর ন্যাশনাল সংগীত গণসংগীতের অগ্রদূত। কিন্তু মুকুন্দ দাস ছিলেন ভাববাদী নেতাদের চেলা। মুকুন্দ দাস চাষীর গান লিখেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাদর্শের প্রভাব বশত নয়।

যাহোক, আগে বলেছি যে, সাধন সরকারের গণসংগীতের সুরারোপের যাত্রা শুরু ষাটের দশক থেকে। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর এতদিনে অনেক তাবড়ো দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারক বাহকের তখন মোহ ভঙ্গ ঘটতে শুরু করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জাঁদরেল উর্দু শাসকের তখন ক্রমেই কোনঠাসা অবস্থা। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাকর্মীবৃন্দ শুধুমাত্র বাঙ্গালীর (পূর্ববাংলা) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নিষ্ঠার সাথে লালন করার তাগিদেই পাঞ্জাবী শাসকের শৃঙ্খল মুক্ত হবার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। ঠিক এই রকম একটি প্রেক্ষাপট সামনে রেখে সেই পঞ্চ কবি থেকে শুরু করে সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পরেশ ধর, অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ সেন গুপ্ত এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অপরাপর সুরকারের সুর-বৈভবে পুষ্ট গণসংগীত নামক গীত শ্রেনীর বাণীতে সাধন সরকার সুরযোজনা শুরু করেন। বলা বাহুল্য ঐ সময়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) গণ সংগীতের আদৌ কোন ধারা সৃষ্টি হয়নি। সেকালে ঢাকা কেন্দ্রিক এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্রিক কিছু গানে আব্দুল আহাদ, আব্দুল লতিফ, বেদার উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সুর সংযোজন করেছিলেন তবে তাকে গণসংগীত না বলে দেশপ্রীতি মূলক কোরাস বা সম্মেলক গান বলা যেতে পারে। নমুনা স্বরূপ ২/১ গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমনঃ আযাদীর এই অরুণ প্রভাতে/নতুন স্বপ্ন সুষমা ছড়ানো/বন্ধনহীন স্বর্ণ ঈগল মেলছে পাখা ইত্যাদি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে একেবারেই ছিল না তা নয়। যেমন আলতাফ মাহমুদের কিছু গান।

সাধন সরকারের গণসংগীতে সুরারোপ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই এই আদলের গানগুলির সুরের চালের উপর দু'চার কথা না বললে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস কিংবা অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় এঁদের সুরারোপিত বেশ কিছু গানকে জনতার সম্পদ বলতে হবে। কিন্তু বাংলা গানে গণসংগীতের আদলে রচিত গানের বেশীর ভাগই খুব সহজ সাদাসিধে চালে সুরারোপিত। প্রায় ক্ষেত্রে সুরকে নিরাভরণ করে গান থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অনেক গানের বাঁধনীতে উপমহাদেশীয় রাগ সংগীতের প্রভাব নামমাত্র। বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। যে কারণে বহুগানেই শ্রোতার মন ভরা তো দূরের কথা কান ভরতে পারে না। কাজেই

সুরের রিক্ততার দোষে প্রায় গানই দুষ্ট। এখানে শুধু কথার আকর্ষণ কেন? গীত শ্রেণী যখন, তখন সুরের আকর্ষণ তো অবশ্যই থাকতে হবে।

আমার ধারণা, এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখেই এই গীত শ্রেণীর সুরারোপে হাত দিয়েছিলেন। তিনি যাদের গানে সুরারোপ করেছেন এঁরা প্রত্যেকেই স্ব-আবর্তে প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং গীত রচনার ভাষা প্রয়োগে কুশলী কারিগর। অনেকেই জানেন অধ্যাপক আবুবকর সিদ্দিকির গীত রচনার ভাষা কত দৃঢ় এবং বঙ্কিমময় গতি সম্পন্ন। শুধু তাই নয় তাঁর রচনা জটিল ও অস্বাভাবিক শব্দ চয়নে পরিপুষ্ট বিমুর্ত রূপায়ন সম্ভারে সমৃদ্ধ সৃষ্টি। যে গানের সুরারোপে বাণীর আভিজাত্যকে ছাপিয়ে সুরের কাঠামোয় ধরে রাখা এক দুঃসাধ্যকর্ম। কিন্তু সাধন সরকার সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়েছেন অবলীলাক্রমে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর দু'একটি শব্দ যেমন 'পাকে পাকে তড়পায়' কিংবা 'ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবলায় নর পাল' ইত্যাদি। এ জাতীয় জটিল শব্দও যে গীত হবার যোগ্য বা সুরের প্রভাবে কত অসহায় সেটা একমাত্র সাধন সরকারই দেখালেন আমাদের। এ গানের সুর বিন্যাস প্রচন্ড ভাবে কথার উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে গানকে সাবলিল করে তুলতে পেরেছে। যেটা সিঃসন্দেহে সুরকারের শক্তিমত্ত্বার পরিচয় বহন করে।

অপরদিকে নাজিম মাহমুদের 'ধ্বংসের পরোয়ানা শোনকি, গানটিও বাণীর দিক থেকে ঐশ্বর্য্যমন্ডিত। গানটিতে বাণীর দুর্বলতা নেই। এখানেও সুর সংযোজনায় সুরের কারুকার্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এ গানটিতে খুবই দক্ষতার সাথে চৈনিক সুরের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। চাইনিজ গানের মাধুর্য এবং বাংলাগানের সুরের সহ-অবস্থান, এমনকি হরিহর ভাব গানটিকে এমন ভাবে অলংকৃত করেছে যে এখানে সুর সংযোজনায় এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। আলোচনার দ্বারা এর মাধুর্য বোঝানো দুষ্কর। এর মধ্যে সুরের অদক্ষতার অত্যাচার নেই। এমনকি কণ্ঠোল্লাস মূলক শ্রোতার সুড়সুড়ি জাগাতে কোথাও অসহনীয় কোন হেঁচকী টান দিয়ে শ্রুতি পীড়াদায়ক কোলাহলযুক্ত আবহ সৃষ্টির নমুনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার সুরটি নিছক আবৃত্তি ভঙ্গিম সুরও নয়। গানটিতে ভিনদেশী সুরের যুগল মিলন ঘটিয়ে এতে সুরের অধিকতর সমৃদ্ধি ঘটার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে ধরা পড়ে। এর সুর সংমিশ্রণ আমাদের কাছে চীনদেশের গানের মতো সুর উপভোগের কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং এ সুর আমাদেরকে আপ্লুত-অনুপ্রাণিত করে তুলেছে।

গণসংগীতের অবয়বে গঠিত, সাধন সরকারের সুরারোপিত আরও অনেক গানই আছে যে গুলির সুর রূপ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনার দাবী রাখে। কেননা-এ জাতীয় গানগুলি এখন শহরের গন্ডী পেরিয়ে গ্রামান্তরে প্রবেশ করেছে ও ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। এ জাতীয় কয়েকটি গান- বজ্র কঠিন শপথ এবার/সূর্যের গৌরব বক্ষে/একক দশক শতক সহস্র কোটি জনতা/কমরেড এই রাত আঁধিয়ার/দেয়ালে দেয়ালে লটকে দাও/জাগো ওঠো জাগো একুশে সকাল/রক্ত তিলক ললাটে

সূর্য/আমাদের চেতনার সৈকতে/ধন্য মাগো তোমার ধুলো/একটুখানি আলো (স্বদেশপ্রীতি) ইত্যাদি।

আবার আমরা কানে দিয়েছি তুলো/গায় মানেনা আপনি মোড়ল/বা আমাদের নানা মত নানা দল-এর মত গান গুলিতে কথার ভাবের সাথে সুরের ভাবের গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের আবহ সৃষ্টি সাধন সরকারের একটি বিস্ময়কর উদ্ভাবন। এখানে গানের গণচরিত্রের সাথে গণসুরের অর্থাৎ পল্লী সুরের আদলে সুর বিন্যাস দেখতে পাই, যার আবেদন সুদূর প্রসারী। এর মধ্যে লোক সংগীতের গণতান্ত্রিক বিস্তারমুখী প্রবণতা। এ এক ধরণের রূপান্তরমুখী প্রক্রিয়া। এখানে নিছক কুলীন সেজে লোক সংগীতের সুরের আদি পবিত্রতা রক্ষা করা হয়নি বলেই আজকের শিল্পায়নের যুগে প্রাচীন লোক সংস্কৃতির এক ধরনের রূপান্তর যা লোকসুরের কৌলিন্য প্রথাকে ছুৎমার্গের মনোভাব থেকে সংকোচন মুক্ত। পল্লী সুরকে এ গানের আদপওয়ারী বাণীর কাঠামোয় কৌশলে ও নিপুণভাবে জোড় কলম করা যে এতে নাগরিক সংগীতের অবয়ব পরিবর্তিত হয়েছে। এটা শহরের কাছে পল্লীর এবং পল্লীর কাছে শহরের এক ধরণের সম্মিলন যার একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সার্থক পথ প্রদর্শক। গণসংগীত পর্যায়ে তাঁর আরও দু'টি গানের উল্লেখ করতে হয় ১। মেঘ জমেছে ঝড় এসেছে এবং ২। ও ভাই কম জন্মেছে ধান। এ দুটি গানের রচয়িতা তিনি স্বয়ং। গান দুটিতে আইরিশ সুর সংকেত বিদ্যমান। এটাও শিল্পীর এক ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। যা কিনা তাঁর সৃজনশীলতার পতাকাবাহী।

মোট কথা গণসংগীতের সুর যোজনার ক্ষেত্রে তাঁর নব নব উদ্ভাবনী নৈপুণ্যের তুলনা পাওয়া ভার। বাংলাদেশে (তৎকীন পূর্ব পাকিস্তান) একমাত্র শহীদ আলতাফ মাহমুদকে বাদ দিলে, এ ধারার অতবড় সৃষ্টি উল্লাসের এক একটি নির্মাণ কৌশল চোখে পড়ে না। এ সৃষ্টির কোনটির উপরই প্রচলিত সুর বর্গীকরণের নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এ যেন এক প্রতিভাবান সুর স্রষ্টার আপন খেয়ালের উদ্দীপ্ত নির্মাণ যার পূর্বাপর নজীর এদেশে অনুপস্থিত। অনুকরণে অসাধ্য এর স্বর বিন্যাসের স্বকীয়তা। এ ধরণের সুরারোপিত গানগুলির সুর বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ খুবই দুরূহ কাজ এবং সে চেষ্টাও নিরর্থক। অনেকে বলেন গণসংগীতের সুরের দিক থেকে কিছু ন্যাড়া ও সুর মুক্ত করে গানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দমুখর ও কোলাহল তাড়িত করে গাইলেই নাকি এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে এবং এর সম্মেলক তথা গণচরিত্র বজায় থাকে। কথাটা যে কতখানি অসার ও ভোঁতা যুক্তিনির্ভর সাধন সরকার তা আমাদের প্রমাণ করে দেখালেন। শুধু একটি কথা বলেই এই পর্বটি শেষ করতে চাই যে, ষাটের দশকে সমকালীন গণসংগীতের সুরযোজনায় তাঁর প্রত্যেকটি গান যেন বিরল প্রতিভার যাদুস্পর্শে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণে ভুষিত। উচ্চমার্গের কল্পনাশক্তি না থাকলে কোন সুরকারের পক্ষে এমনতর অভিনব সৃজনী বৈশিস্ট্য ফুটিয়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই সঙ্গত কারণে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে হচ্ছে। এখানে আমরা একজন বিশ্ব বিখ্যাত গণসংগীত শিল্পীর সাথে সাধন সরকারের

চারিত্রিক মেল বন্ধন দেখতে পাই অনেকটা। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি গণসংগীত শিল্পী পল রবসনের কথা বলতে চাচ্ছি। পল রবসন ছিলেন তাঁর জীবনের নির্যাতনের বেদনাকে গণমানুষের নির্যাতনের বেদনার সাথে মিলিয়ে নিজেকে একাত্ম করে দিয়ে সর্বহারার দুঃখ মোচনের লক্ষ্যে এক নিবেদিত প্রাণ শিল্পী। তাঁর লক্ষ্য সাম্যবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ বলশালী ও ওজঃগুণ বিশিষ্ট কণ্ঠ সম্পদে ভরপুর। কণ্ঠের প্রকৃতি অনুসারে তিনি খাদ (ব্যাস) স্বরের গায়ক অর্থাৎ ভারতীয় সংগীতের পরিভাষায় উদারা গ্রামে তার স্থিতি। পাশ্চাত্য সংগীতে পুরুষ কণ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে উদারা গ্রামের শিল্পীকে 'ব্যাস', মুদারা গ্রামের ক্ষেত্রে 'ব্যারিটোন' এবং তারা গ্রামের ক্ষেত্রে 'টেনর' বলা হয়। এই মানে সাধন সরকারের কণ্ঠ স্বর এবং মন মানসিকতার ধরণ আমাদেরকে পল রবসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধন সরকারেরও প্রশস্তবক্ষ কণ্ঠ স্বর, তাঁর দেহের বলশালীতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ, মোটা গভীর গম্ভীর গাঢ়তা বা তিগ্মতা (ইন্‌স্টেনসিটি) যুক্ত পল রবসনের আওয়াজ অনুরূপ।

আমি এখানে পল রবসনের সাথে সাধন সরকারের তুলনাটি স্থাপন করছি উভয়কে নিক্তি ওজনে সমপর্য্যায়ভুক্ত করার মানসে নয়। আমি শুধু বোঝাতে চাইছি যে, গণসংগীতের কেত্রে পল রবসনের প্রকৃতি ও মননের অনেক কাছে আসতে পেরেছিলেন সাধন সরকার। পল রবসনের অনেক অনেক গানের মধ্যে 'ওল ম্যান রিভার কিংবা 'মাই ওল্ড কেন্‌টাকি হোম বা জন ব্রাউন বডি" এর কথা মনে পড়লে সাধন সরকারের কমরেড এই রাত আঁধিয়ার/একটু খানি আলো/বা গাঁয় মানেনা আপনি মোড়ল/জাতীয় গানের কথা মনে আসে। এ সব গান গুলি যখন তার কণ্ঠে শুনেছি তখন তার কণ্ঠস্বরের প্রকৃতি, স্বরক্ষেপনের পদ্ধতি, এবং তাঁর গলা তারাগ্রামে উঠানোর কায়দা, সব কিছুতেই এক ধরণের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব খুঁজে পেতাম। এতে ভারি গলার ওজনদারীত্বের সাথে এক ধরণের কমনীয়তা ও সুমিষ্টতার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যেত যেটা বর্ণনায় বোঝানো যাবে না। বস্তুতঃ তাঁর গণসংগীতের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে পাই একজন সমাজ সচেতন মানবপ্রেমী প্রগতিশীল শিল্পী হিসেবে।

সাধন সরকারের সুরসংযোজিত বেশ কিছু ছড়াগান ছিল যে গুলি আজ আর কেউ বড় মনে করেন না। এই গানের দু'একটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমনঃ ধান কোথায় গো আমার ক্ষেতে/নীল আকাশে কাক চিলেরা (রোকনুজ্জামান খান)/কোন দেশেতে তরুতলা (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দেশপ্রীতি মূলক)। এ সব গানের সুরারোপ সত্তর দশকের প্রথমার্ধে। ওই সময়ে বাচ্চাদের শেখাবার মতো গানের স্বল্পতা ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এ ধরণের গানে তিনি সুরারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। ষাটের দশকে যখন সন্দীপনে এ গানের ক্লাস চালু করা হোল তখনও কিন্তু বাচ্চাদের শেখাবার মত গানের আরও বেশী সংকট। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে উনি কাজী নজরুল ইসলামের প্রজাপতি প্রজাপতি গানটি জলদ দাদরা তালে নিবদ্ধ করে সুর করলেন। কারণ সেই সময়ে

নজরুল ইসলামের স্বরলিপিসহ তিনখানা বইতে মাত্র ৮০/৮৫ টির মত গান বেরিয়েছে। ও গানটা যে আসলে গান, তাও আমাদের ঠিক মতো জানা ছিল না। যাহোক গানটি তখন সন্দীপনের গানের ক্লাসে নিয়মিত শেখানো হতে লাগলো এবং গানটি সাংঘাতিক রকমের জনপ্রিয়তা পেল। নাসিমা নামের একটি মেয়ে ওই গানটি গেয়ে ২/১টি প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও ঘরে তুল্‌লো। আমরা গানটির সুর শুনে সকলেই হতবাক্। কি অদ্ভুতই না হয়েছিল গানটির সুর বিন্যাস। এর অনেক পরে অবশ্য ও গানটি স্বরলিপিসহ আমাদের হাতে আসে। তবে সেটা কাহারবা তাল সম্বলিত। কিন্তু কেন জানি আমার এখনও মনে হয় যে, বর্তমান প্রচলিতসুরের চাইতে সাধনদার সংযোজিত সুরটি আমাকে বেশী আকর্ষণ করতো। পাঠক আমাকে মার্জনা করবেন। আমি কিন্তু কোন রকম উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কথাটি প্রকাশ করছি না। এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ মাত্র। তো যে কথা বলছিলাম, বাচ্চাদের গানের প্রয়োজনেই তাঁকে কিছু ছড়াগানে সুর করতে হয়েছিল। এ ধরণের সুরগুলির ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়, এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরে কণ্ঠ সাধনার 'সরগম' গতের সাথে হুবহু মিল রেখে এর স্বর বিন্যাস করা। যেমন সা রা গা মা-মা গা রা সা, রা গা মা পা-পা মা গা রা অথবা সা গা, রা মা, গা পা বা সা রা গা গা রা সা ইত্যাদি। এ গানগুলিতে এই ধরনের গতের সাথে সুরের সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? শিশুদের কণ্ঠ সাধনার গৎ গুলি আয়ত্ব হলেই তারা কিন্তু অনায়াসে গান গাইতে (ছাড়াগান) পারছে। কেননা এখানে গৎ আর গানে কিন্তু কোন তফাত নেই। শুধু মাত্র 'সারগম'এর বদলে কথাগুলি বলে যেতে পারলেই হোল। এতে করে অন্যদিকে শিশুদের আস্থার সঞ্চার হচ্ছে। গান গাইবার প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা কিন্তু সাধন সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবিত ঢং। এ জাতীয় style ইতিপূর্বে কখনও আমার চোখে পড়েনি। তাঁর সুর সংযোজিত এ ধরণের গান এখনও হয়তো কিছু পাওয়া যাবে স্কুল অব মিউজিক, খুলনা কর্তৃক প্রকাশিত "গঙ্গা ফড়িং" নামক ছড়াগানের বইটিতে।

সাধন সরকারের সুর সংযোজনার বছরগুলিকে মোটামুটি এভাবে আমরা ধরে নিতে পারি। যেমন পঞ্চাশ-এর দশক শুধুমাত্র আধুনিক এবং কয়েকটি রাগ প্রধান গানে সীমাবদ্ধ। এরপর ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য সুর যোজনা মূলতঃ গণ সংগীতকে (একুশের গানসহ) কেন্দ্র করেই। বিখ্যাত গণসংগীতগুলিতে এই দশকেই তিনি সুরযোজনা করেছিলেন। অবশ্য এর সাথে কিছু (দু'চারটি) রাগ প্রধান গান যে ছিল না তা নয়।

এরপর সত্তর-এর দশক তাঁর সুরের পরীক্ষা নিরীক্ষার চূড়ান্ত পর্ব। এ সময় তিনি চর্যাপদ, মধুসুদন কাব্য, সুকান্তের গীতি কবিতা , অভিযানের গীতি নাট্যরূপ দান, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা ইত্যাদিতে সুর সন্নিবেশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন প্রধানতঃ। এছাড়া পল্লীগীতির সুর সংকেতে 'ভাটিয়াল' নামক একটি নূতন রাগও সৃষ্টি করেন। নতুন রাগ সৃষ্টিতে তাঁর একটি উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি প্রায়ই

বলতেন "নতুন রাগ সৃষ্টি করে হবে কি? মার্গ সংগীতের ভান্ডারে রাগের যে অমূল্য সম্পদ আছে তারই কতটুকু আমরা আহরণ করতে পেরেছি ?"

শেষ দশক অর্থাৎ আশির দশকে তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আধুনিক গান আছে যার বেশীর ভাগই রেডিও বাংলাদেশ খুলনা কেন্দ্র থেকে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকা দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। আশির দশকে এসে তাঁর আর এক সৃষ্টি সংযোজন হোল অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক রচিত 'শমসের বাওয়ালী' নামক গীতি নাট্যে পল্লী আশ্রয়ী সুরযোজনা। এ গীতি নাট্যের গানগুলির সুরের বাঁধুনী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তিনি লোকসুরের উপরও ভালো দখলদার ছিলেন। এ গানগুলিতে গ্রাম্য সুরের সাথে শহুরে সুরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সুর সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এর ভেতর যুগ প্রভাবের ছাপ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এর রূপরীতিতে নতুন কালের রুচির আভাস। যদিও লোক সংগীতের ঐতিহ্য গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় সৃষ্ট এবং পুষ্ট তথাপি বর্তমান প্রেক্ষাপটের বিচারে দেখা যায়, কি গ্রামবাসী কি শহরবাসী, দু'টি সম্প্রদায়ই এখন লোক সংগীত উপভোগের অংশীদার। এখনতো পল্লীর সংকীর্ণ গন্ডি ছাপিয়ে লোক সংগীতের ধারা শহরকে স্পর্শ করেছে। কাজেই এটা যে অবিকৃত রেখে পুরাতনেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এমন কি কথা? যাই হোক এটা আমার নিজস্ব আজকের বক্তব্য। আমার মনে হয়েছে সাধন সরকার এ বিষয়ে অনেক আগে থেকে ভেবে রেখেছিলেন। আর তাই 'শমসের বাওয়ালী'-এর সুরারোপে তাঁর এই উত্তরণ দেখতে পাই।

সাধন সরকারের সুরারোপের উপর আলোচনা আমার মত আলস্যপরায়ণ কূপমন্ডুকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তবুও লালসাকীর্ণ হয়েই এ দুঃসাধ্য কাজে হস্তক্ষেপ করেছি। সময় অভাবে, স্বল্প পরিসরে, বিরল বিস্মৃতির কারণে এবং সর্বোপরি অনেকের কাছে গানের আবেদন করে না পাওয়াতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গীতিকারের সমুল্লেখযোগ্য সুরসমৃদ্ধ গানের উপর আলোচনা সম্ভব হোল না। পাঠক আশা করি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আগামীতে যদি প্রতিপাদ্য বিষয় হাতের নাগালে পাই এবং সময় সুযোগ স্বাস্থ্য অনুকুল সাড়া দেয় তাহলে আরও কিছু গানের সৃষ্টিশীল দিকগুলি নিয়ে সাধন সরকারের উপর আলোচনার ইচ্ছা রইল।

এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ ঘুরে এ আলোচনায় ইতি টান্‌বো। আমি জানিনা মানুষের জীবন মৃত্যুর চাবিকাঠি ঈশ্বরের হাতে সত্যিকার অর্থে আছে কিনা। যদি তাই হয় তবে তো বলার কিছুই নেই। আর যদি মানুষের পক্ষে কিছু থেকে থাকে তাহলে আমাকে বলতেই হবে তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য আমার মত অনেক স্বজন-প্রিয়জন দায়মুক্ত নন। আমরা সকলেই জানতাম সাধন সরকারের আহার পান্তাভাত আর কাঁচালঙ্কা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বাড়ীতে প্রতিদিন কেরোসিনের প্রদীপ টিম্ টিম করে জ্বলে রাত্রে। অথচ সবকিছু জেনেও না জানার ভান করেছি। আমার মত অনেক সংস্কৃতিসেবী সাধন সরকারের সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠেছেন কিন্তু উপরে গিয়ে পেছনের ধাপে তাকাবার অবসর কে কতটুকু দিয়েছেন আমি জানি না। তবে এটা জানি যে, স্কুল অব মিউজিকের সাথে তাঁর মতানৈক্য, রেডিও বাংলাদেশ খুলনা

কেন্দ্র থেকে উপেক্ষিত, এমনকি স্বজন-পরিজনের নির্জন নির্লিপ্ততা তাকে অষ্ট্রপ্রহর কুরে কুরে শেষ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে তার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রমণ। চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান এর কারণ করণের বিশ্লেষণ মূলক ব্যখ্যা দিতে পারবে নিশ্চয়। তবে আমি শুধু আটপৌরে কথায় বল্‌তে পারি তার এ দূরারোগ্য ব্যাধির মূল সূত্র দারিদ্র্যের কষাঘাত এবং স্বজনের অপঘাত।

স্বাভাবিক ভাবে কথা উঠতে পারে সাধন সরকারের চিকিৎসা বাবদ প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকা তো তাঁর হিতাকাঙ্খীরাই ব্যয় করেছেন। এ বিষয়ে লেখকের মত ভিন্ন। আমি মনে করি এ খরচ ও প্রচেষ্টা সময়ানুপাতিক ক্রম রক্ষা করতে পারেনি। আমি এটাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চাই যে, এই প্রচেষ্টা তাঁর রোগ যন্ত্রণা ভিন্নার্থে জীবন যন্ত্রণাকে প্রলম্বিত করেছে। সাধন সরকার প্রসঙ্গে যে যুক্তি গুলির উপর আমরা অনেকেই মোটামুটি প্রশস্তি বোধ করি তা হচ্ছে তাঁর চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয়, তাঁকে জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ থেকে পদক ও অর্থ প্রদান, শিল্পকলা একাডেমী থেকে পদক অর্থপ্রদান, স্থানীয় ভাবে একুশে পদক ও অর্থ প্রদান ইত্যাদি। আমি মনে করি এর কোনটিতেই আমরা সময়ের চাহিদা রক্ষা করতে পারিনি। এ কাজগুলি সবই হয়েছে তাঁর জ্বরাগ্রস্ত অবস্থায়। পাঠক শুধু একবার ভাবুন যে এ কাজগুলি যদি আমরা তার জীবনাসানের ১০ বছর আগে করতে পারতাম তাহলে কি হতে পারতো। সুতরাং আমরা, যারা সংস্কৃতির সেবক বলে দাবি করি, গুণীজনের প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে হবে বলে চীৎকার করি কিংবা গুণীর কদর দেবার জন্য ভাবে বিগলিত অবিশ্রাম কারিগর, আমরা কি পারিনা আমাদের মজ্জাগত ত্রুটি থেকে বেরিয়ে আস্‌তে? আমরা কি পারি না সময়ের কাজটি উপযুক্ত সময়েই নিষ্পন্ন করতে ? আমার মনে হয় রাষ্ট্রিক পর্য্যায় থেকে ব্যক্তি পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিষয়টির গুরুত্বারোপ করা দরকার।

যাহোক শেষ করার আগে সেই পুরানো কথা, তিনি এলেন, জয় করলেন এবং চলে গেলেন। আমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কারণ যা নেবার-বোঝার বা জানার ছিলো তার কোনটাই আমি নিতে, বুঝতে এবং জানতেও পারিনি তার কাছ থেকে। এ দৈন্যতা আমাকে সব সময় পীড়া দেয়। তাঁর পঞ্চাশের দশকে সুরারোপিত গান "আমার আকাশে আজ মোহন ধ্বনি বাজে" (আবুল বাশার)। এ গানটি গেয়ে তিনি জাতীয় পর্য্যায়ের দ্বিতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন এবং এটা দিয়েই তাঁর সুর যোজনা শুরু–যার শেষ করলেন ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে 'ভয় হয় যদি কোন দিন আমার এ গান থেমে যায়'-(সুশান্ত সরকার) গানটি শুধুমাত্র স্বয়ং গাইবার জন্য সুরারোপ করেন।

স্বর্গ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তবে মৃত্যুর পর মানুষের যদি সত্যিই স্বর্গপ্রাপ্তির সুযোগ থাকে তাহলে ঈশ্বর যেন তাঁকে সেখানেই স্থান করে দেন এই কামনা এবং আত্মার শান্তি কামনা করে আমার এ শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করছি।

কেউ আর ডাকবে না কোন জলসায়

সুশান্ত সরকার

সাধন সরকার নামের একজন দারুন মানুষ খুলনায় আছেন, একথাটা শুনেছিলাম কলেজ জীবনে। কিন্তু লোকটিকে চাক্ষুষ দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ফেরার পর। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। পরিচয়ের প্রথমে একটু বিব্রত যে হইনি, তেমন নয়-আমার কল্পনার সাথে সাধন সরকারের বিন্দুমাত্র কোন মিল খুঁজে পাইনি। শামসুর রহমান রোড আর আহসান আহমেদ রোড, যেখানে একে অপরকে অতিক্রম করেছে ঐ চৌরাস্তার মোড়ে একটি চা-মিষ্টির দোকান ছিল—দাদুর দোকান বলে যার একডাকের নাম। জীবদ্দশা পর্যন্ত দোকানটি তেমনি ভাবেই টিকেছিলো—দাদুর দোকানের অন্য কোন নাম ছিল কিনা জানিনা, এমনকি দাদুর নামও জানতে চাইনি কোনদিন। দাদুর দোকানে সাধন সরকারের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। বেটে খাটো—বেশ ভারী গলার স্বর দুধহীন লিকার চা কাপ থেকে প্লেটে ঢেলে চুমক দিচ্ছেন আয়েসের সাথে। আমার তৎকালীন এক বন্ধু চিনিয়ে দিলেন এই সেই সাধন সরকার।

আমার কল্পনার সাধন সরকার, সন্দীপনের সাধন সরকার-এত সহজ লভ্য হবেন প্রথমত বিশ্বাস হয়নি। দ্বিতীয়ত এতবড় মাপের মানুষ সাধন সরকার এত সাধারণ হবেন এটাও বুঝতে আমার সময় লেগেছে। দাদু পরিচয় করিয়ে দিলেন—একেবারেই সহজে। 'সাধন বাবু,এই ছেলেটি আপনার সাথে আলাপ করতে চায়।' সাধন বাবু অত্যন্ত সহজে আমাকে গ্রহণ করলেন—'বেশতো—আসো, বসো। চা—খাবা।' সাধন বাবু সাধারণত খুলনার আঞ্চলিক ভাষা বলতেন—তাঁর ব্যবহারিক জীবনে। সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। দিনক্ষণ মনে নেই। শুধু মনে আছে আমাকে দাদুর দোকান থেকে একটু দূরের একটা পানের দোকান দেখিয়ে খয়ের ছাড়া পান কিনে আনতে বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। মনে হয় যেন কত কাল হয়ে গেলো। দাদুর দোকানে বসে তিনি আমার পরিচয় জেনে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আমি কেমন সরকার। কেননা তাঁর পদবীটাও সরকার ছিল সেজন্যে। আমি ব্রাহ্মণ সরকার শুনে, তিনি নির্বিকার। পরে আমাকে দিয়ে পুজো করিয়ে ছেড়েছেন।

সাধন সরকার ঐদিনই—আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন—বিদ্যুতের আলো ঝলমল শহরের মাঝখানে নোনা ধরা একতলা বাড়ী—হ্যারিকেন জ্বলছে। তিনি তাঁর

স্বভাব সুলভ গভীর গলায়—মাসিমা অর্থাৎ তাঁর মা সুখদা সুন্দরী দেবীকে ডেকে বললেন—এই তোমার আর এক ছেলে। নাড়ুর মাকে ডাকো। নাড়ুর মা অর্থাৎ সাধন সরকারের স্ত্রী মাধুরী দেবী। বিদুষী, বুদ্ধিমতী, কর্মঠ এবং মাতৃসমা মহিলা বিরাট এক ঘোমটা টেনে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আমার সামনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে—সাধন দা, ভরাট কণ্ঠে তাঁকে জানালেন—'আমি তাঁর দেওর, তিনি আমার বৌদি।' হ্যাঁ আজো সুখে দুঃখে, আনন্দে বিষাদে বৌদি—আমাকে ঠাকুরপো ডেকে থাকেন, যার ভাগী আর কেউ নেই।

সাধন সরকারের পৈত্রিক নিবাস ঢাকার মানিকগঞ্জের দাসোরা গ্রামে। পিতা কেশবচন্দ্র দে সরকার সরকারী চাকুরী করতে খুলনায় এসেছিলেন। আর স্বগ্রামে ফিরে যাননি। মির্জাপুরে জমি কিনে একতলা দুই কামরার একটি আবাসন গড়ে তুলেছিলেন আজো যা' তেমনি আছে—প্রকৃতি ও আকৃতিগত কোন পরিবর্তন হয়নি। আকস্মিক কেশববাবু দেহরক্ষা করলে শিশু সাধনকে নিয়ে সুখদাসুন্দরী দেবী খুলনাতেই থেকে গেছেন। যে কারণে, খুলনায় সাধন বাবুর পিতৃ বা মাতৃকূলের কোন আত্মীয় নেই। এবং পিতা মাতার একমাত্র সন্তান বিধায় অন্য কোন বৈবাহিক সূত্রে কোন স্বজন তৈরী হয়নি। তাই তাঁদের পারিবারিক আত্মীয়তার বন্ধন আমার সাথে দৃঢ় হয়েছিল যেমন, অন্য আর একটি ঘটনায় তেমন একটি সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল সুদূর চট্টগ্রামবাসী সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহার পরিবারের সাথে। সত্যেনবাবুর ছেলে রামু, আমার ভাই সুকান্ত আর নিজের ছেলে নারুর মধ্যে কোন ফারাক তাঁর ছিলনা।

সাধন দার সাথে আমার পরিচয় পারিবারিক রূপ নেয়। আমি স্থায়ী ভাবে খুলনায় চলে আসার পর এই সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। সাধনদা সে সময় এ দেশের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। সন্দীপনের প্রাণপুরুষ, প্রগতিশীল আন্দোলনের সামনের সারির মানুষ। আমার এবং তাঁর ক্ষেত্র হিসেবে সংস্কৃতির অঙ্গন হলেও আমি কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে রেখেছি। এ সময় সন্দীপন ভেঙ্গে গেল। সাধন দা কি করেন—নিজের জীবিকার জন্যে বাড়ীর ছোট ঘরটায় গান শেখান—গানের টিউশনি করেন আর তৎকালীন পার্কের উল্টো পাশে মণ্ডল মিউজিক অর্থাৎ ননী বাবুর হারমোনিয়ামের দোকানে আড্ডা দেন। হঠাৎ করে একদিন ননীবাবুর দোকানে বসে বলে বসলেন, আমি তবলায় ঠেকা দিতে পারি একথা সত্যি কিনা? আমি মাথা চুলকাতে শুরু করলে তিনি উঠলেন এবং সরাসরি বাসায় এসে তাঁর আদরের সহযোগী কালো রং এর সিঙ্গেল রিড হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন-প্রথম গান ধরলেন-'চুলকাইতে চুলকাইতে পরাণ যায়, মরলাম রে ভাই দাউদের জ্বালায়।' (এ গানের কথাটি আমি আমার বিভিন্ন লেখায় বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছি—যা' সাধন সরকারের কাছ থেকে শেখা)। আমি অবাক, তিনি বেশ ধমকের সুরে বললেন—ঐ সুরটাকে ভেঙ্গে তিনি নতুন একটা ছন্দে এনেছেন—এখন কথার দরকার, আমাকে কথা তৈরী করতে হবে এবং হুকুম। আমি তাঁর হুকুম রাখতে চেষ্টা করেছিলাম। জানিনা সে গান আর কোনদিন কেউ গাইবে কিনা। মাসিমা ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিলেন। হাতে তাঁর ঠাকুরের প্রসাদ। দু'খানা বাতাসা দু'জনকে ধরিয়ে দিলেন, সাধনদার আর একখানার প্রত্যাশা ছিল।

সাধনদার মিষ্টির প্রতি একটা টান ছিল। অন্য কোন খাবার দিলে সামান্য কিছু হয়ত

খেতেন—কিন্তু মিষ্টির বেলায়—না সাধনদাকে ফেরানো যেতোনা। মিষ্টি একটা দিলে শেষ—দশটা দিলেও অবশিষ্ট থাকতো না। মিষ্টান্ন বা পায়েস পছন্দ করতেন দারুন। আমার স্ত্রী যাকে তিনি ছবি দেখে পছন্দ করেছিলেন প্রচুর মেয়ে তাঁর হাতের কাছে থাকতেও, তাকে মিষ্টান্ন রাঁধতে বলতেন—বেশী মিষ্টি দিয়ে। মিষ্টি কম হলে রেখে দিয়ে উঠে পড়তেন এবং বেশ শক্ত কথা শোনাতেন। সেই মিষ্টি সাধন দা আর স্পর্শ করেননি। বহুমূত্র রোগাক্রান্ত তিনি কবে হয়েছিলেন—কিন্তু যখন ধরা পড়লো তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সাধন দা আর মিষ্টি খাননি। বিজয়ায় নারকেলের নাড়ুর প্রতি সাধনদার দারুন দুর্বলতা ছিল। তিনি সব কিছু জয় করে ফেলেছিলেন—স্পর্শ করেনি আর মিষ্টি—একটা নারকেলের নাড়ু পর্যন্ত। সাধন দা ইলিশ মাছ পছন্দ করতেন। এবং সে কি পছন্দ তা' বলে বোঝানো যাবেনা।

শেষের দিকে অর্থাৎ সন্দীপন ভেঙ্গে যাবার পর স্বাধীনতার যুদ্ধ। তারপর দেশে ফিরে মরহুম আজীজ খানের আগ্রহে স্কুল অব মিউজিক নিয়ে মেতেছিলেন। আজীজ খান সাহেব দেহরক্ষা করার পর ক্রমশঃ সাধনদা নিজেকে গুটিয়ে ফেলছিলেন। প্রায়শঃই ঘরের বাইরে যেতেন না। বিশেষ করে সকালের দিকে। তখন তাঁর সাথে ঘরে বসে যা গল্প হতো তার কোন মাথা মুণ্ডু থাকতো না। তবে যদি খাওয়ার কথা উঠতো—তবে ইলিশ মাছ অবশ্যই। শুধু তাই নয়, ইলিশ মাছের কত রকমের রান্না তার পছন্দ অকপটে বলে যেতেন। সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন ভাটেল চাল, মুগের ডালের পাতলা খিঁচুড়ী আর ইলিশ মাছ ভাজা। ভাটেল চালের কথায়, অন্য কথা মনে পড়ে গেল—পরে বলছি সেকথা। আপাতত, ইলিশ মাছের কথাই বলি। এই সময়টাতে সাধনদা বোধ করি ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। খুব কাশি হতো—গান গাইতে কষ্ট পেতেন। আর একটু গরম এলেই সারা গায়ে ফোঁড়ার মত কি সব উঠে যেতো। একদিন তাঁর পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে গেলেন, ডাক্তার অভিমত দিলেন—এগুলো এলার্জি, ইলিশ মাছ খাওয়া চলবেনা। তিনি তাঁর সহজাত খুলনার ভাষায় স্পষ্ট উত্তর দিলেন, 'কেমোন ডাক্তার তুমি। ইলিশ মাছ খাবোনা তা হলি এহানে জন্মালাম কেন? ইলিশ মাছ খাবো—তারপরে যদি পারো ওষোধ দেও। দেহি তুমি কেমন ডাক্তার।' ইলিশ মাছ সাধনদা ছাড়েন নি, মৃত্যুর আগেও যখন খেতে পারতেন না-তখনও তিনি ইলিশ মাছ হলে এক টুকরো নয় দু'টুকরো খেতেন। বলছিলাম—ভাটেল চাল। সাধন দা ভাটেল চাল খুব পছন্দ করতেন। একসাথে এক বস্তা তিনি কিনতেন না। কারণ ছিল, তা হলে ঐ চালের গন্ধটা নষ্ট হয়ে যাবে। ভাটেল চাল আমাদের এই ভাটি অঞ্চলের এক ধরনের মোটা ধানের আতপ চাউল। যার একটা প্রাণকাড়া মিষ্টি গন্ধ আছে। ভাটেল চালের সাথে নিরামিষ বিশেষ করে শাক সজি পছন্দ করতেন খেতে। মুড়ি ঘন্টের ডাল ছিল—তার আর এক পছন্দের খাবার। আসন পিঁড়ি হয়ে বসে—ভাটেল চালের ভাত মুড়িঘন্টের ডাল, মোচার ঘন্ট সাথে দুখানা বেগুন ভাজা এবং একট—শুকনো লঙ্কা ভাজা—সাধনদার কি পরিতৃপ্তির আহার!

ভাটেল চালের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আর একটা প্রসঙ্গ এসে গেলো। সাধনদা নিজেকে পুরোপুরি ভাবে ভাবতেন এই ভাটি অঞ্চলের মানুষ। ভাটির নদী, ভাটির দেশ—তার

মনে তার চেতনায় অনেক খানি জুড়েছিল। ভাটিয়ালী গান এই ভাটির দেশের নিজস্ব সম্পদ। একদিন কথায় কথায় বললেন—ভাটিয়ালীর মত সমৃদ্ধ সুর নিশ্চয় কোন রাগ আশ্রয়ী হবে। তিনি খুঁজতে শুরু করলেন। তার কারণ রাগ সঙ্গীতের ইতিহাসে জৌনপুরের গান—জৌনপুরী, ইয়েমেনের গান—ইমন, ভূপালের নামে ভূপালী—তাই ভাটির দেশের ভাটিয়ালী কেন থাকবে না। ভাটিয়ালীর উদাস করা সুর অবশ্যই থাকতে হবে। খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল মার্গ সঙ্গীতে দুটো রাগের নাম আছে ভাটিয়ার। একটা খাম্বাজ থাঠ, অপরটা মারওয়া থাঠে। কিন্তু এ দুটোর কোনটার সাথে ভাটিয়ালীর অন্তর্বেদনার কোন সম্পর্ক নেই—ভাটিয়ালীর সুরের কোন স্পর্শ ওখানে নেই। সাধনদা—ভাটিয়ালী সুরের উপাদান ও উপকরণকে নিয়ে, ভাটির নদীর শূন্যতাকে আশ্রয় করে সৃজন করলেন রাগ ভাটিয়াল। থাঠ খাম্বাজ, বাদীস্বর শুদ্ধ গান্ধার, সমবাদী, ধৈবত, জাতি ঔড়ব, সম্পূর্ণ সময় রাত্রি প্রথম প্রহর, আরোহ—না সা গা মা ধা ণা র্সা, অবরোহ র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা। যা' সাধন সরকারের জীবনের প্রচুর সৃষ্টির মধ্যে অনবদ্যও অনন্য সাধারণ।

সাধনদা, স্রষ্টা ছিলেন—সুর স্রষ্টা। এ দেশের গণ সঙ্গীতের স্রষ্টা হিসেবে বাংলা সঙ্গীতে যার জুড়ি নেই—আই,পি,টি এর অন্যতম কর্ণধার সলিল চৌধুরীর সাথে কেবল যার তুলনা করা যায়। কিন্তু সাধনদার অন্য একটা সৃষ্টির নেশা ছিল। তিনি প্রাচীন বাংলা কবিতা চর্যাগীতি সেই আমলে প্রচলিত এবং নির্দেশিত রাগের ওপর রেখে তেমনি করে সুর দিয়ে, গেয়ে পাগল করে তুলেছিলেন। এমনি কত কাজ করে গেছেন চোখের পরে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অংশ বিশেষের সুর করেছেন একেবারে ব্রজের কীর্ত্তনের মত ছন্দ বিভাজন করে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের অভিযান কাব্য নাট্যকে তিনি অবলীলায় সুর সংযোজন করে গীতিনাট্যে নিয়ে গেছেন। জীবনানন্দ দাশের অষ্টাদশ মাত্রার সনেট, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, আবার আসিব ফিরে' সুরের ঐন্দ্রজালে নিয়ে গেছেন-ভাবের ঊর্ধ্বালোকে। একেবারে শেষের দিকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা যেজন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ, অয়ি সুখময়ী উষে প্রভৃতি কবিতাকে কি অবলীলায় তিনি এক একটি গানে রূপান্তরিত করেছেন-ভাবতে অবাক লাগে। তাঁর কবি বন্ধু নগেন দাশের গদ্য কবিতায় "নদী আমায় বলেছিল গান শোনাবে" কি আশ্চর্য মোহনীয় সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছিলেন আমার কাছে সে এক পরম বিস্ময়। সুরের সাথে সাথে তিনি চেয়েছিলেন নতুন আর একটি জিনিষ সৃষ্টি করতে। এ দেশীয় মার্গ সঙ্গীতের লক্ষণগীত সমূহ সবই হিন্দীতে। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল ঐ গানগুলো বাংলা একই মাত্রা ও তাল বিভাজনে রূপান্তরিত করা। আমাকে কতবার কতভাবে উৎসাহিত করেছেন কিন্তু আজ করি কাল করি বলে করা হয়নি। আজ তিনি নেই—আমার অনুশোচনা হচ্ছে কোনদিন আর করা হবেনা। সাধন দা সাহিত্য সৃষ্টিতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন—তিনি নাটক লিখেছিলেন দুটো—বেশ কতকগুলো কবিতা ও ছড়া, ছোট গল্প এবং মূল্যবান সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ যা প্রকাশিত হয়নি কিন্তু বড় অসামান্য সৃষ্টি।

সাধনদা যৌবনে ভাল ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলতেন। পছন্দও করতেন খেলা

দুটোকে। আশির দশকে কোথাও কোন খেলা থাকলে তার ধারা বিবরণী নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতেন। বিশ্বের তাবৎ নামী দামী খেলোয়াড় এবং তাদের খেলা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ ধারণা ছিল। যখন খেলা থাকতো না—তখন ঘরে পিতার আমলের শালকাঠের বিছানাহীন চৌকির উপর শুয়ে—পড়তেন এবং সব পড়তেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, এমনকি ফুলটির (তাঁর একমাত্র কন্যা, সুতপা) ক্লাসের বই পর্যন্ত। শুধু পড়তেনই না—সাধন দা ছিলেন তুখোড় সমালোচক। কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না। মুখের পরে বলে বসতেন তার কোথায় ত্রুটি। সবাই জানে সাধনদা কথা বলতেন না-কিন্তু সাধনদা যা' কথা বলতেন এমন তাৎক্ষণিক সুন্দর বৈঠকী কথা কম লোককেই বলতে শুনেছি।

খুলনা রেডিওতে একবার একটি পূজার অনুষ্ঠানে সাধনদা সঙ্গীত পরিচালক, আমি রচয়িতা, আমার স্ত্রী কানন সরকার কণ্ঠ শিল্পী এবং আমার ছোট ভাই সুকান্ত সরকার ধারাভাষ্যকার। চার সরকারের একত্র মিলনেকে একজন মন্তব্য করলো আপনারই তো সব। সাধনদার উত্তর ঘরে থাকতে পরকে দেবো কোনো? সাধন দা রসিক ছিলেন দারুণ, কোন কথার ফাঁকে কখন একেবারে চুপসে দিতেন ভাবতে অবাক লাগে। একবার নাকি সাধনদাকে কোথাও ডেকে নিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল রাতে ভাঁয়রো রাগ গাইতে। তিনি ইচ্ছে করে ইমন রাগ ধরলেন শ্রোতারা না বুঝে বাহবা দিলে, তিনি গানের বাণী বানিয়ে ফেললেন- শা-আ-আ-লা-আ-। এমনি নানাবিধ শব্দ। এবং প্রচুর গালাগালির পর গান থামিয়ে চা খেয়ে চলে এলেন। পরের দিন আমাদের কাছে বলে সে কি হাসি।

হাসতেন এবং হাসাতেন—নজরুলের বিখ্যাত গান 'আমি যার নূপুরের ছন্দ গাইতে গাইতে, আস্থায়ীতে আছে কে সে সুন্দর কে—সাধন দা গেয়ে উঠলেন কে সে সুন্দর—'কেডা'। সাধনদা পরের দেয়া সিগ্রেট খেতেন মাঝে মধ্যে। একদা তাঁর এক প্রিয় ব্যক্তি একটি সিগ্রেট দিয়ে তাতে আগুন ধরাতে গেলে সেই আগুন ছিটকে তাঁর জামায় ও পাজামায় লেগে যায়—তিনি তৎক্ষণাৎ গেয়ে উঠলেন-'তুমি যে বিড়ির আগুন লাগিয়ে দিলে মোর জামায়। সে আগুন ছড়িয়ে গেল পায়জামায়, পায়জামায়—তুমি যে বিড়ির আগুন লাগিয়ে দিলে।'

স্মৃতি—কত স্মৃতি—আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে স্মৃতিতে। শেষ স্মৃতি না আমি ভুলতে পারছিনা। বৌদি, বিশু, জগো—কফিন মোড়া সাধনদাকে নিয়ে মির্জাপুরে এসেছেন—সে কফিন আমাকে ধরে নামাতে হয়েছে— বৌদি ডুকরে উঠছেন—ঠাকুরপো আপনার দাদাকে নামান—আর তাঁর কোন ভয় নেই।

শেষ দিকে এসে সাধনদা কেন যেন জীবনবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন—একটা ভয় তাকে আঁকড়ে ধরেছিল। একদিন আমাকে বললেন—একটা গান লেখতো যার মধ্যে তুমি আর আমি দু'জনে বেঁচে থাকবো। আমি গান লিখলাম—'ভয় হয় যদি কোনদিন আমার এ গান থেমে যায়, যদি কোন উদাসী বিকেলে এ পোড়া হৃদয় আর কথা না জোগায়'। গানটা দেখে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সুর করলেন। বললেন, যদি আমি তাঁর আগে মারা যাই তিনি আমার শোক যাত্রায় গাইবেন সেই গান—আর তিনি আগে মারা গেলে আমি যেন সেই গান বাজিয়ে শোনাই। তিনি আমার আগে

চলে গেলেন, নিজের জীবনের শেষ অনুষ্ঠানে সেই গান গেয়ে। তাঁকে কেউ আর ডাকবে না কোন জলসায়। সাধন সরকার আমার সাধন দা চলে গেলেন আষাঢ়ে প্রথম দিনের ভোরে, আমাদের একা করে দিয়ে। আজ আমার সাধন দা অমৃত লোকের বাসিন্দা "ন হণ্যতে, হণ্যমানে শরীরে।"

সাধন সরকারঃ মৃত্যুর দু'বছর পর

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়াত সাধন সরকারের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন করে খুলনার বিভিন্ন সংগঠন প্রমাণ করলেন মৃত্যুর দুই বৎসর পরেও খুলনাবাসীর মন থেকে তিনি মুছে যান্‌নি। খুলনার মানুষ তাঁকে মনে রেখেছে, স্মরণসভা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সংস্কৃতি দূষণের এই বন্ধ্যা আর বিভ্রান্তির সময়ে যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন সেকথা মনে রেখেই হয়তো আরো কিছুকাল তাঁকে স্মরণ করা হবে। তারপর সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি হারিয়ে যাবেন।

সাধারণ মানুষ ছিলেন সাধন সরকার। মৃত্যুর পর অমরত্ব লাভের চাইতে জীবিতাবস্থায় তাঁর সৃষ্টি ও সাধনা অব্যাহত রাখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন ছিল তাঁর বেশী। তিনি তা পান্‌নি। তাতে তিনি থেমে থাকেননি, ভেঙেও পড়েননি। আমরা তাঁকে সভাপতি বানিয়েছি, সেরা সম্মানিত আসনটিতে স্থাপিত করেছি, কখনো ভাবিনি সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথা যেখানে তাঁর সংগীত সাধনা অবিরাম ও অবাধ হতে পারত; কিম্বা তাঁর সৃষ্টি সংরক্ষণের কথা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাংগীতিক উত্তরাধিকার হয়ে থাকতে পারত। ঊনসত্তরের উত্তাল দিনগুলিতে সন্দীপন পেরেছিল,-একথা আজ অস্বীকার করা যাবেনা যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এবং সেরা কীর্তি সন্দীপনেরই উদ্দীপনার ফসল।

স্মরণসভার সাড়ম্বর আয়োজনের সবটাই জুড়ে থাকে শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর স্মৃতিতর্পণ। কেউ তাঁর দারিদ্র্যের বিস্তৃত বর্ণনা দেন, কেউ নিজেকে তাঁর সবচাইতে ঘনিষ্ঠজন ঘোষণা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, কেউবা পালিত না হওয়া প্রতিশ্রুতির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে পুলকিত বোধ করেন। এ থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির দেউলিয়াত্ব আর মিথ্যাচারিতাই প্রমাণিত হয়। আর এই দেউলিয়াত্ব আড়াল করার জন্য তারা রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের মতো সাধন সরকারকেও তাদের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেন। সম্মিলিত উদ্যোগ আর আন্তরিকতায় তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার মতো ব্যয়বহুল, দুরূহ একটি কাজ করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে তাঁর সুরারোপিত গান সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কেন সম্ভব হয়না? স্মরণ সভার সৎ আয়োজনকে বিন্দুমাত্র খাটো না করে একথা বলতে চাই তাঁর স্মৃতিরক্ষায় স্থায়ী কোন উদ্যোগে কেউ এগিয়ে আসেননি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুখোড় বক্তার মতো আমরা বক্তৃতা দিয়েছি-কাজে নামিনি।

আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কিছু না হওয়ার পেছনে নানা কারণ কাজ করছে। প্রথমত (ক) সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সামগ্রিক স্থবিরত্ব, নূতন কিছু সৃষ্টির জন্য নূতন কোন ভাবনা নেই, শিক্ষা কিম্বা তাগিদও নেই, আছে প্রথারক্ষার জন্য পূরোনকে নূতন করে পরিবেশনের এক ঘেয়েমি। দ্বিতীয়ত (খ) সংগীতের সৃজনশীল কাজে লিপ্ত থাকার মতো সংগীত গুণীর একান্ত অভাব। সৃষ্টির জন্য একান্ত সাধনার কথা ভুলে সকলেই সস্তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটছে। তৃতীয়ত (গ) স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির দেউলিয়া অবস্থা। চতুর্থত (ঘ) উঠতি ধনীর সংস্কৃতিসবৌ হবার বিচিত্র বাসনা এবং নেতৃত্বে আসার নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। ব্যক্তি স্বার্থ বড় হলে শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

শিল্পী শুধুই একজন পারফর্মার নন, তিনি একজন স্রষ্টাও, সাধন সরকার কতবড় একজন স্রষ্টা ছিলেন তার পরিমাপ করা কখনোই হয়তো সম্ভব হবে না। সংগীত শুধু সখ নয়, শিক্ষা এবং সাধনা এর সাথে সম্পৃক্ত। জীবিকার জন্য সংগীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করায় তাঁর শিল্পীজীবন ব্যাহত হয়েছিল। শেষের দিকে মনের মতো পরিবেশ, শ্রোতা না পেলে গাইতে চাইতেন না। বিশেষ অনুরোধে গাইলেও গান শেষে অনুরোধকারীর বুদ্ধিরসীমা পরখ করতেন, কখনোবা রাগসংগীত গাইবার ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে নির্বোধ শ্রোতার প্রতি এক ধরনের ব্যঙ্গ আর বিদ্রুপ প্রকাশিত হত। আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে শিল্পীর যে অসম্মানজনক অবস্থান তার বিরুদ্ধে এই ভাবেই যেন তার অনুচ্চারিত ক্ষোভ প্রকাশিত হত।

এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি ঘটনার কথা বলতে চাই। কোনদিন হয়তো সন্দীপনের ইতিহাস লেখা হবে। লেখা হবে সাধন সরকারের জীবন-ইতিহাস। নাজিম মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দিকের মতো নগেন দাশও সংগীত রচয়িতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন সন্দীপনের সাথে। শিক্ষকতা করতেন সেন্ট জোসেপস স্কুলে। চেহারা, পোশাক, কথাবার্তায় ছিল নিখুঁত রুচি আর পরিশীলনের ছাপ। একাত্তরের বেশ কিছু আগেই তিনি দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ওখানে গিয়েও স্কুলের শিক্ষকতা করতেন, লিট্‌ল ম্যাগাজিন লিখতেন। নগেন দাশের সাথেই আবার দেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। সাধন সরকারকে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিনের সেই মুহূর্তটির কথা কখনো ভুলতে পারবনা।

কলকাতার ১৪৪ নম্বর লেনিন সরণী যখন বাংলাদেশের শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠের "ব্যারিকেড, বেয়নেট বেড়াজালে"র মহড়ায় মুখরিত তখন এগানের স্রষ্টা একটু আশ্রয়ের জন্যে কলকাতার জনারণ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ফরিদপুরের গ্রামে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থেকে ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুঁইয়ে কোনভাবে প্রাণে বেঁচে মুক্তিযুদ্ধের শেষে দিকে তিনি ভারতে এসে পৌছন। নগেন দাশ তাঁকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁকে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করছিলেন। কলকাতায় বিজয় গড়ে তার অপরিসর ভাড়াটিয়া বাসায় তিনি একদিন একটি ঘরোয়া সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্যে ছিল ওদেশের তাঁর জন্য কিছু ছাত্র ছাত্রী সংগ্রহ করে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ঐ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত

ছিলাম। দেখেছিলাম তীব্র সংকটের মধ্যেও পরিচিত প্রিয়জনের সান্নিধ্যে তিনি কত স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেন।

সতেজ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আপোষ বিমুখ, সকলের শ্রদ্ধাভাজন শিল্পী সাধন সরকার আপন মনের মাধুরী, শ্রম এবং সাধনায় যা সৃষ্টি করে গেছেন তার মধ্যেইতো তাঁর বেঁচে থাকার কথা। তাঁর সুরারোপিত গান, আবিষ্কৃত রাগ, বেতারে তাঁর গাওয়া গানের ক্যাসেট, তাঁর ওপর নির্মিত ভিডিও ফিল্ম,-সবকিছু সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল।

মৃত্যুর পর কিছুই থাকেনা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয় মৃত্যুর আগে অসুস্থ শরীরে নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁর সুরারোপিত গানের স্বরলিপি প্রণয়নের। সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যায়। এখনও সময় আছে, মিলিত একটি উদ্যোগে হয়তো সম্ভব করে তোলা যায় সে কাজ। এই কাজের মধ্যে দিয়েই কেবল তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানান যেতে পারে। এখনো যারা তাঁর গান গাইছেন, গানের সূত্রে বিভিন্নভাবে যারা তাঁর সাথে যুক্ত ছিলেন, সংগীত শিক্ষক এবং সংস্কৃতি কর্মী সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে আর আন্তরিক ইচ্ছাতেই কেবল একাজ সম্ভব হতে পারে।এই উদ্যোগে এখুনি এগিয়ে না এলে স্মরণসভার সব আয়োজন পণ্ডশ্রম প্রমাণিত হবে, তুখোড় বক্তাদের সব বক্তৃতাই রবীন্দ্রনাথের গানের মতো মনে হবেঃ

'যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে।'

কোন সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবার সৌজন্য বোধ হয় আমরা হারিয়ে ফেলছি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর ব্যয়ে রাজশাহী থেকে অপেশাদার তরুণ শিল্পীদের দিয়ে সাধন সরকার সুরারোপিত গানের একটি ক্যাসেট তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হওয়ার অর্থ তাঁর সৃষ্টি স্থায়ী একটি রূপ পাওয়া। এই প্রয়াসটিও এখানে প্রকাশ্যে সমালোচিত হতে দেখেছি। দ্বিতীয় একটি ক্যাসেট করার পরই বোধ হয় এই সমালোচনা শোভন হত। একটি ক্যাসেটের ব্যয়ভার বহন করা খুলনার সংস্কৃতিসেবীদের জন্য কি খুবই গুরুভার একটি ব্যাপার ছিল? আমরা জানি চেতনার সৈকতের গানগুলি এবং স্কুল অব মিউজিকে রক্ষিত কিছু গান ছাড়া তাঁর সুরারোপিত গানের আর কোন মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি নেই। প্রয়াত আজিজ খান এবং নাজিম মাহমুদ যা পারলেন আমরা তা পারলাম না কেন? খুলনার অনেক গীত রচয়িতাই তাঁদের গানে সুরারোপ করিয়েছেন তাঁকে দিয়ে, সেকি শুধুই বেতার, টেলিভিশনের তালিকাভুক্তির জন্য?

আমার দেখা সাধন সরকার

গৌরী শংকর ঘোষ

অভাবে স্বভাব নষ্ট এই প্রবাদটা সর্ব ক্ষেত্রে যে ঠিক নয়, তা প্রয়াত আচার্য শ্রী সাধন সরকার মহাশয়ের আমৃত্যু-আজীবনের দিকে একটু ভালো ভাবে দৃষ্টি-পাত করলে জানা যায়। খুব নিকট থেকে তাঁকে একান্ত ভাবে দেখার, জানার সুযোগ, যাঁদের হয়েছিলো আমি ও সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। ১৯৫৮ সন থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাথে চলা, কাছে বসা, এমন কি তাঁর পরিবার ভূক্ত আপন জনের মত তাঁকে জানার বোঝার যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তার যে কি মূল্য, তা মূল্যায়ন করতে চাওয়া যে কত বড় মূর্খামি তা একমাত্র আমিই বুঝি। সংগীতাঙ্গনে তাঁর পারদর্শিতা দূরদর্শিতা কতখানি, কিম্বা তিনি কত বড় মাপের শিল্পী ছিলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলবো না। শুধু এইটুকুই বলবো যে, তাঁর মত জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ ক্ষোভ তাঁর হৃদয়কে যে কিভাবে দহন করেছে, তার নীরব সাক্ষী মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে আমিও একজন।

এই শহর খুলনার সাধারণ মানুষ যাঁরা সাধন বাবুকে চিন্‌তো-অথচ জানতো না তাঁরা কখনোই তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতেন না। তার পিছনে যে কারণ কিছু ছিল না এমন নয়। আমি তাই সংগীত শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য সাধন সরকারকে ছেড়ে ব্যক্তি সাধন বাবু সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছি। তবে সর্বাগ্রে একান্ত বিনীত ভাবে আমার লেখা কিম্বা বলে বোঝানোর দীন্যতার কথা স্বীকার করছি। একথা, অনেকেই জানেন যে পিতৃ বিয়োগের পর কিশোর সাধন সরকার নিজে গান শিখে সেই গান ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়ে এবং আয়কৃত অর্থ-দিয়েই বিধবা মা ও নিজের উদারন্নের সংস্থান করেছেন। তবু অভাব-দারিদ্রের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। যে বিষয়, যে কথা তিনি সত্য বলে জেনেছেন, অকপটে তিনি তা মেনে নিয়েছেন। সাধন সরকার প্রবঞ্চক, প্রতারক কিম্বা তার জীবদ্দশায় কখনো মিথ্যাচার করেছেন এমন কথা তার কোন শত্রুতেও বল্‌তে পারেনা। কারো অযাচিত অনুগ্রহকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে সারা জীবন প্রত্যাখান করেছেন। যে কোন স্থানে যে কোন পরিবেশে অথবা যে স্তরের মানুষ হোকনা কেন স্পষ্ট উচিত কথাটা মুখের উপর বলতে তিনি কখনো কাউকে

ছাড়েননি। সত্য কথা অনেকেই সইতে পারেনা, আবার সত্য পথের পথিককে অনেকেই নির্বোধ ভাবে। তাছাড়া সত্য কথাও বিগলিত বিনয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই সব নানা কারণে সাধন বাবুকে অসাক্ষাতে কিছু লোকে দুর্মুখ বলতো। সাধারণের সাথে সাধারণ ভাবে মিশতে না পারার কারণেও অনেকের কাছে তিনি অহংকারী বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। তবে সব থেকে আনন্দের কথা হলো এই যে, এই অখ্যাতিই তাঁকে একদিন খ্যাতির শীর্ষে উঠতে সাহায্য করেছিল।

একগুঁয়ে অসামাজিক দুর্মুখ এই সব বিশেষণে যারাই তাঁকে ভূষিত করে থাকুক না কেন, তারা দূরের মানুষ। অজ্ঞাতে অসক্ষাতে এসব কথা তাদের বলা শোভা পায়, যারা তাঁকে নিকট থেকে দেখার, জানার উপলব্ধি করার সুযোগ পায় নাই। তিনি যে সত্যিই সুরসিক ছিলেন তা তাঁর অসংখ্য সুরারোপিত গানে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘুণে ধরা সমাজের বুকে প্রচণ্ড আঘাত করে তিনি যে কত বড় মাপের একজন সমাজ সংস্কারক সচেতন নাগরিক ছিলেন, তার স্বাক্ষর অনেক ছোট গল্পে তিনি রেখে গেছেন।

অন্ধের হাতী দেখার মত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কথা না বলাই ভালো। কারণ, তাঁরা সাধন বাবু সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। আমি তাঁর অগণিত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নিতান্তই একজন অযোগ্য শিষ্য বলে নিজেকে মনে করি। কেননা মহাসমুদ্র থেকে ঝিনুকে করে কতটুকু জল তুলে আনা যায়? তাঁর মত নির্লোভ, আপন ভোলা-অথচ তীক্ষ্ণ আত্মসচেতন একজন সাধককে অতি নিকট থেকে কাছে পাওয়ার সুযোগ পাওয়া যে কত বড় পাওয়া; আর এই পাওয়ার গর্ব যে কত তা আমি বুঝি। তবু কখনো কখনো খুটি নাটি দু'একটা ঘটনায় তাঁর সাথে আমার তর্ক বেঁধেছে। কথা কাটাকাটির শেষে রাগারাগিও হয়েছে। তবে তা খুবই সামান্য সময়ের জন্য। তাঁর উদারতার কাছে আমার সংকীর্ণতা বেশী সময় টিকতে পারেনি। এমনি একদিনের ছোট ঘটনার কথা বলি। মির্জাপুর রোডে তাঁর বাড়ী থেকে বিকেল বেলায় দু'জনে ইউনাইটেড ক্লাবে আসছি। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো গত কাল সন্দীপনে বিশেষ কে যেন একজনকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। সে সভায় আমি ছিলাম না। ক্লাবে আসার পথে সাধন বাবুর কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি শুধুমাত্র তাঁর নামটা বলেই চুপ করে গেলেন। আমি সামান্য এই উত্তরে তৃপ্ত হতে না পেরে আরো কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেই, সেই রাস্তার মধ্যে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রচণ্ড এক ধমক লাগিয়ে দিলেন "অতশত দিয়ে তোমার দরকারটা কি হে; এ্যাঁ লাভটা কি শুনি?" হাসি ঠাট্টা গল্প করতে করতে বেশ দুজনে হাটতে হাটতে ক্লাবের দিকে আসছিলাম। ভালবাসায় নাকি অপমান সহ্য হয় কিন্তু অবজ্ঞা অবহেলা একেবারেই সহা যায় না। মুহূর্তে কি হয়ে গেল। অভদ্র, ইতর, ছোটলোক ইত্যাদি বেশ কয়টা কড়া কথা বলে তাঁর মত লোকের সাথে আর যে কোন সম্পর্ক রাখা যায়না তা জানিয়ে দিলাম। এই শহরে আমিও একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী– আমারো যথেষ্ট মান সম্মান আছে। যদিও ঠিক ওই মুহূর্তে আমার মনে ছিলনা যে, আমার মান সম্মান- যা কিছু, তার মূলে তিনিই সবকিছুর হোতা। অথচ যাঁর উদ্দেশ্যে এই তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হলো, তিনি

সম্পূর্ণ নীরব। কোন তাপ-উত্তাপ আছে বলে মনে হোলনা। প্রতিবাদ শূন্য আঘাতে ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। তাঁর পিছু ছেড়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে থানার মোড়ে এসে বাঁদিকে বড়বাজারের পথে পা বাড়ালাম। সাধন বাবু ডানদিকে ঘুরে সোসাইট সিনেমা হলের পাশে ইউনাইটেড ক্লাবে আসবেন। হঠাৎ শুনি তিনি আমায় ডাক্‌ছেন, "কি হলো-ক্লাবে যাবানা? ওদিকে ক'নে যাও।" আবার যেন কি আমার হয়ে গেল। মুহূর্তে পূর্বের প্রতিজ্ঞা, প্রচণ্ড রাগ কোথায় উবে গেলো। জন্ম নিলো তীব্র অনুশোচনা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একি করলাম; এ-কাকে কি বল্লাম। যিনি সারা জীবন বিনা প্রত্যাশায় নীরবে শুধু দানই করেছেন, তাঁর সেই দানের সামান্য মর্যাদাটুকুও রাখতে পারলাম না। বেশ বুঝতে পারলাম অকৃতজ্ঞ শব্দটা শুধুমাত্র আমার জন্যই অভিধানে সযত্নে রক্ষিত আছে। পিছু পিছু নিঃশব্দে ক্লাবের গেট পর্যন্ত এসে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে তিনি বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, "আবার কি হলো এ্যাঁ?" তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়তেই হাঃ হাঃ করে হেসে বল্লেন, "তো বাপু তুমি আমার মোসাহেব নাকি" হ্যাঁ হুজুর হ্যাঁ হুজুর বলে সব কথায় সায় দেবে। আমার আচরণ তোমার ভালো লাগেনি তুমি প্রতিবাদ করেছো ঠিক করেছো"–বলতে বলতে আমার পিঠের পরে হাতখানা রাখলেন। চোখের জলে সেদিন আবার তাঁকে নতুন করে চিন্‌লাম। কিন্তু কতটুকু তাঁকে চিনলাম কতটুকুই বা দুরের মানুষেরা তাঁকে জেনেছে। ফুটবল খেলোয়াড় সাধন বাবুকে আমি দেখিনি, তবে ব্যাডমিন্টন এর কোর্টে জাম্প দিয়ে স্মাইং চাপ মারার সেই যুদ্ধং দেহী মূর্তি যারা দেখেনি তারা কতটুকুই তাঁকে দেখেছে? ক্যারাম বোর্ডে হাজার চেষ্টা করেও কোন দিন এই লোকটাকে হারাতে পারিনি। দাবা খেল্‌তে গিয়ে কত বড় বড় মহারথীর কিস্তি যে মাত্ করেছেন কয় জন তার হিসাব রাখে। আমার কথা বাদ দিয়েই বলি তাস্ খেলায় অনিবার্য হার হবে জেনে পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাতের তাস্ ছুড়ে ফেল্‌তে অনেককেই দেখেছি। ব্যক্তি সাধন সরকার আর সংগীতজ্ঞ সাধন সরকার যেমন দুই মেরুতে বাস করতেন তেমনি রসিকতায় ও অন্যায়ের প্রতিবাদেও দেখেছি দুটা ভিন্ন সত্তা। হাঃ হাঃ হাঃ শব্দে নিজেও যেমন ঘর ফাটানো হাসি হাস্‌তে পারতেন, আবার ছোট ছোট চুটকি বলে অপরকেও হাসাতে তাঁর জুড়ি ছিলোনা। স্থুল রসিকতাকে তিনি সযত্নে চিরকালই এড়িয়ে গেছেন। প্রচণ্ড ক্রোধেও তাঁর মুখ থেকে একটা অশ্লীল কথা কেউ শুনেছে বলে আমার মনে হয় না। যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি একাই একশো ছিলেন। আমার জীবনে দেখা হাজারো ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনার কথা বলার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করতে পারছি না।

খুব সম্ভব ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে হবে। করোনেশন স্কুলে সরকারী পর্যায়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খুলনাসহ আশপাশ জেলায়ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কোন ওস্তাদ কি রাগ পরিবেশন করবেন এবং ঠিক কোন সময় থেকে কোন সময়ের মধ্যে অকুস্থলে কোন অফিসারের নিকট নাম লিখিয়ে উপস্থিতি জানাতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ আমন্ত্রণ পত্রে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। বিচারকের আসন সুযোগ্য সরকারী কর্মকর্তারা অলংকৃত

করবেন। তাতে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে? অনুষ্ঠানটা তো তাঁদেরই। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই সাধন বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে এসে রিক্সা নেবো। মোড়ের আলোতে এসে দেখি, সাধন বাবুর গায়ে আনকোরা পাট ভাঙা পাঞ্জাবী আর পরণে আধা ময়লা পাজামা। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ফিরে গিয়ে জামা কাপড় পাল্টে অনুষ্ঠানে পৌছাতে স্বাভাবিক ভাবেই একটু দেরী হয়ে গ্যালো। এই দেরী হওয়ার কারণেই হোক কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে হোক অফিসার লোকটা ভাল চোখে দেখলেন না। গম্ভীর ভাবে এটা ইয়ার্কি মারার জায়গা নয়; তা তিনি সাধন বাবুকে জানিয়ে শুনুন বলেই হাতে ধরা কাগজ খানায় চোখ বুলিয়ে বল্লেন, "আপনি রাগ বাগেশ্রী গাইবেন, ঠিক আছে?" এ্যাতক্ষণ সাধন বাবু কিছুই বলেন নি। এবার বিনীতভাবে বল্লেন, "তা কি করে হয়, আমি তো এক সপ্তাহ ধরে মালকোষ প্রাক্টিস করেছি। চিঠিতে তো ওই রাগই গাওয়ার কথা বলা হয়েছে" অফিসারটার এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্লো। কারণ হিসেবে আমার যা মনে হয় তা হোলো এই যে, প্রথম দেরী করে আসা। তারপর ইনি একজন কর্মকর্তা, তাকে সালাম না জানানো। তৃতীয় কারণ হলো, এ্যাতো বড় একটা অনুষ্ঠানে যিনি গান গাইবেন তাঁর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী ভর্তি। কেমন একটা কিম্ভুতকিমাকার চেহারা। অবশ্য এসবই আমার অনুমান মাত্র। অফিসার পদে যারা থাকেন, বিশেষত সরকারী কর্মকর্তা, তাদের ধৈর্য্য মোটেই থাকার কথা নয়। চেয়ারের হাতলে সশব্দে একটা চড় মেরে বেশ উত্তেজিত হয়েই বল্লেন, "দেখুন মিয়া, তর্ক আমি মোটেই পছন্দ করি না। যা বল্লাম তাই গাইবেন। নইলে লিষ্টি থেকে নাম কেটে দেবো।" সাধন বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। বরঞ্চ পূর্বের তুলনায় আরো যেন নরম গলায় বেশ বিনয়ের সাথে বল্লেন, "আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে; তবে আমায় একটু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।" এতক্ষণে অফিসারের মুখে একটু হাসির আভাস দেখা গ্যালো। তিনি বেশ উদার হয়ে বল্লেন, "শিওর শিওর, বলুন কিভাবে আপনাকে হেল্প করতে পারি?" নিতান্ত মুখ কাঁচু মাঁচু করে বলেন, "ওই বাগেশ্রীর বাদী সমবাদীটা ঠিক মনে করতে পারছি না- একটু যদি বলে দিতেন; কিম্বা ঔড়ব না ষাড়ব জাতিতে পড়ে-" আমি নীরব দর্শক। অফিসারের দিকে চেয়ে দেখি মুখে বিরক্তি, চোখ ছানাবড়া। বেশ খানিকটা বিরক্তির সাথে বল্লেন, "জাতি ফাতি বাদী ফাদি কি সব আবোল তাবোল, ওসব কি আমাদের জানার কথা?" হঠাৎ যেন বোমা ফাট্লো। প্রচণ্ড এক ধমক লাগিয়ে সাধন বাবু বল্লেন, "ফাজলামো করার আর জায়গা পান্নি না? রাগ রাগিনী কাকে কয় তা কখনো শুনেছেন? জানেন কিছু? গানের বিচারপতি চান? বিচারটা কি লোকের মুখ দেখে করবেন? শোনেন, আমি সাধন সরকার এই অর্বাচিন এর আসরে গান গাইনা, বুঝলেন?" বলেই আমার হাতে এক হেঁচকা টান দিয়ে বল্লেন, "চল হে গৌর যত্তসব-। দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে গজ্ গজ্ করতে করতে বেরিয়ে এলেন দুপ দাপ পা ফেলে। আমি জানতাম দু পাঁচটা রাগ তাৎক্ষণিক ভাবে গাইতে তাঁর পাঁজি পুঁথি দেখার দরকার হতোনা। কারণ, আমরা তখন প্রায় প্রতি দিনই কোন না কোন রাগ সাধন বাবুর বারান্দা ঘেরা ছোট্ট ঘরটাতে সকাল নয়টা থেকে প্রায় বারোটা- একটা পর্য্যন্ত প্রাক্টিস করতাম। তাঁর আমার এই ত্রিশ বত্রিশ বছরের জীবন যাত্রায় কত

অসংখ্য ছোট বড় ঘটনা ঘটেছে ফিরিস্তি দিতে গেলে কয়েকশ্ পৃষ্ঠার একখানা বই হয়তো লেখা যায়। ব্যক্তি সাধন বাবু সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছি, জানিনা তা কতটুকু সফল হয়েছে। তা যাই হোকনা কেন, আমার জীবনে তাঁর সাথে তুলনা করার মত আর যে কাউকে পাই না, তা আমার জীবন্ত অস্তিত্বের মতই সত্য। তাই আমার পরম পূজ্যপাদ গুরুর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্য সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।।

মিজানুর রহিম স্মরণে

ডাঃ এম, এ, মানাফ

১৯৬১ সালে ডাঃ মহবুবর রহমান ধর্মসভা রোডে এবং আমি যশোর রোডে চেম্বার করে মেডিকেল প্রাক্টিস শুরু করি। প্রথম দিকে রোগীপত্তর বেশী না থাকায় প্রায়ই ডাঃ মহবুবের ওখানে দুবেলা ঘুরতে যেতাম। এখানে একজন নাতিদীর্ঘ একহারা, সুঠাম ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার যুবকের সাথে পরিচয় হয়। যাঁর নাম মিজানুর রহিম। ডাঃ মহবুবের চেম্বারের উপর তলায় তাঁর একটা ওকালতির চেম্বার ছিল। কিন্তু সেখানে তাঁকে কখনো দেখা যেত না। ক্রমে সখ্যতা হতে দেরী হয় নাই। একজন প্রগতিশীল সাহিত্য ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার লোক ছিলেন প্রয়াত মিজানুর রহিম।

আমি দৌলতপুর কলেজ ছেড়ে ১৯৫০ সালের শেষ দিকে ঢাকায় যাই– তখন বা তার পরের বছর থেকে বোধ হয় মিজানুর রহিম দৌলতপুর কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজে তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবময়। কারণ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে খুলনার যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জেল খেটে ছিলেন মিজানুর রহিম তাঁদের অন্যতম। পরে বি. এ এবং ল' পাশ করে কবে ওকালতি শুরু করেন, সে ইতিহাস আমার জানা নাই।

যা হোক সেই ১৯৬১ সাল থেকে মরবার আগ পর্যন্ত মিজানুর রহিম ছিলেন আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দোসর। ষাটের দশকে আজিজ খান ও ব্যাঙ্ক অফিসার আমানুল্লা হক (দু'জনেই প্রয়াত) নিয়ে আমাদের একটি পাক্ষিক ও পরে মাসিক সাহিত্য বৈঠক বসত। আমি বোধ হয় কয়েকটা রম্য রচনা পাঠ করেছিলাম। মিজানুর রহিম ও আমি সৈয়দ মুজতবা আলী বর্ণিত পাঁড় পাঠক ছিলাম। একটা ভাল বই পেলে বা পড়লে আমি পড়ে তাঁকে পড়তে বলতাম এবং আমরা আমাদের মত বিনিময় করতাম। কয়েকবারের করুণ অভিজ্ঞতার ফলে আমি সাধারণতঃ কাউকে আর আমার বই ধার দিই না- কিন্তু মিজানুর রহিমকে আমি দিতাম।

না, ওকালতি মিজানুর রহিম করেননি। ওটা ছেড়ে দিয়ে এক জেনারেল ইন্সিওরেন্স অফিসে চাকুরী নেন।

তাঁর আব্বা, শ্বশুর, শ্যালক সবাই পুলিশ বিভাগের অফিসার হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজে ঐ বিভাগে চাকুরীর সুযোগ পেয়েও তিনি সে চাকুরী নেননি। ওকালতি ও পুলিশের চাকুরীর কাজ কারবার দেখে তিনি ঐ দুই পেশাকে নির্মমভাবে সমালোচনা করতেন।

ষাটের দশকের শেষে মিজানুর রহিম ঢাকার অফিসে বদলী হয়ে যান। এ সুযোগ তিনি হেলায় হারান নি। তিনি বাংলায় এম, এ পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে পাস করেন। স্বাধীনতার পর খুলনা অফিসে তিনি আবার বদলী হয়ে আসেন এবং এটাই হোল তাঁর কাল। কারণ, দেশ স্বাধীন হবার পরে কিছু লোক যেভাবে লুঠপাঠের আবাধ সুযোগ গ্রহণ করে–তাঁর নিরীহ শিকার হন মিজানুর রহিম। পাটের গুদামে আগুন দিয়ে বানোয়াট উচ্চ ক্ষতিপূরণ নেবার চেষ্টা করে দৌলতপুরের এক পাট ব্যবসায়ী, আর তার দায়িত্ব বর্তায় মিজানুর রহিমের ঘাড়ে। কারণ, না বুঝতে পরে কিছু কাগজ পত্রে তিনি সই দেন। এ ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরে মামলা চলে। মিজানুর রহিম এটার অসহায় বড়ে হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে অর্ধেক বেতনে দীর্ঘ কয়েক বছর কাটাতে বাধ্য হন। এ সময় প্রায় প্রত্যেক দিন তিনি আমার চেম্বারে কিছু সময় কাটিয়ে যেতেন। আলোচনা না থাকলে চুপচাপ বসে কিছু একটা পড়ে যেতেন।

যদি কেউ ঘুণাক্ষরেও মনে করে থাকেন যে ঐ জাল-জুয়াচুরীতে মিজানুর রহিম কোন পক্ষ থেকে টাকা খেয়েছিলেন তবে তা ভুলে যেতে পারেন। কারণ, আমি জানি কী দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে তাঁর সে কয়েক বছর কেটেছে। তাঁর স্ত্রীকে চাকুরী নিতে হয়েছে। তিনটি সন্তানের লেখা পড়া ও ভরণ পোষণের ব্যাপার ছিল। সবাই মুখ বুঁজে এ দারিদ্রকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য তাঁকে আত্মীয় স্বজন দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে বললেও তিনি যাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মানজনক ভাবে এ দায় থেকে উদ্ধার পান। এবং কয়েক বছর সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অফিসার হিসাবে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন।

ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী খুলনা ছেড়ে ঢাকা ও অন্যত্র যেতে বাধ্য হন– তবুও মিজানুর রহিম কিছুদিন খুলনায় ছিলেন। নিজে স্বহস্তে পাক করে খেয়ে দু'বেলা বইয়ের দোকানে- মাঝে মাঝে আমার চেম্বারে কিছু সময় কাটাতেন। পরে যখন ঢাকা যেতে বাধ্য হন তখন অনিচ্ছাসত্বে তিনি যান। তাঁর এ যাওয়াকে আমার নিজের পক্ষে একটা বড় লোকসান মনে হোত। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব- তার সমমনস্ক লোকদের সাথে মেলামেশা করবার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। আমি খুব বেশী লোকের সাথে মিশতে পারিনি। তাই মিজানুর রহিম যাওয়াতে আমি অনেকটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে থাকি। তবে তাঁর এ যাওয়া যে শেষ যাওয়া তা কোনদিন ভাবতে পারিনি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে মিজানুর রহিম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্য যেমন উপন্যাস, কবিঁতা, নাটকের প্রতি তাঁর যেমন ছিল আগ্রহ তেমনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের তিনি ছিলেন একজন প্রচণ্ড ভক্ত। টানাটানির সংসারে থেকে তিনি পুরা এক সেট রবীন্দ্ররচনাবলী সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর গানের ক্যাসেটে অধিকাংশ ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীতের। নিজে ভাল আবৃত্তি করতেন এবং ভাল অভিনয়ও করতেন। নাট্য নিকেতনের মঞ্চে তাসের দেশে তাঁর অভিনয়ের কথা অনেকের মনে থাকার কথা। লেখক শিবিরের তিনি একজন সক্রিয় কর্মী ও সদস্য ছিলেন। মনে পড়ে স্বাধীনতার পর শান্তিধামের মোড়ের বাড়িটার দোতলায় তিনি ও আজিজ খান মিলে কিভাবে School of Music এর পত্তন ও প্রসার করেন। পরে শিশু মনোজাগতিক বিদ্যালয়ের সাথেও তিনি আমৃত্যু জড়িত ছিলেন।

দুঃখ মিজানুর রহিমের অকাল মৃত্যুতে ও বছর খানেক পরে তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনীর মৃত্যুতে। আনন্দ, তাঁর দুই পুত্র এক কন্যা এই অভাব অনটনের মধ্যে থেকেও সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান রূপে গড়ে উঠায়।
আমরা যেন মিজানুর রহিমকে না ভুলি।

আমার দৃষ্টিতে মিজান ভাই

ডাঃ মহবুবর রহমান

মরহুম মিজানুর রহিম খুলনার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রিয় নাম। আমি খুলনায় ১৯৬০ সালে স্থায়ীভাবে আসি তার আগে থেকেই মিজান ভাই সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে অনেক কথা শুনেছিলাম। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সময় সম্পর্কে আমার মধ্যে প্রচুর ভুলভ্রান্তি থেকে যাবে। যতটুকু শুনেছি, পাঁচের দশকের প্রথমদিকে খুলনার প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ওই সময় আমার শ্বশুরালয়ে তিনি এবং তাঁর অন্যতম সাথী জাহেদুর রহিম খেতেন এবং ধর্ম সভা ক্রস রোডে তৎকালীন পার্টি অফিসের মেঝেতে থাকতেন। বাকী সময় কাটতো পার্টির কাজকর্ম নিয়ে। তাঁর বই পড়ার প্রচণ্ড নেশা ছিল, খাওয়ার সময়ও তিনি বই পড়তেন, খাওয়ার চেয়ে বই পড়ার আগ্রহ ছিল বেশি। মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত আমি লক্ষ্য করেছি তাঁকে বই এর দোকানে বসে অনেক খদ্দেরের মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা বই পড়ে যেতে। তাঁর বাড়ীতেও ছিল বিভিন্ন ধরনের বই এর সংগ্রহ। "বাম বিচ্যুতির" এই পর্যায় মূল নেতৃত্ব আত্মগোপনে থাকলেও তিনি যতটুকু সম্ভব দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমি শুনেছি। এই সময় তিনি দৌলতপুর কলেজে পড়তেন এবং পরবর্তীতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময় তিনি বেশ কিছুদিন জেলে থাকেন। জেলখানার অনেক মজার মজার গল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা শুনেছি। পরবর্তীতে ওকালতি এবং এম. এ পাশ করেন। ল. পাশ করে তিনি ধর্ম সভায় চেম্বার নেন, কিন্তু ওকালতি পেশা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় তিনি ওই পেশা পরিত্যাগ করেন। ১৯৬০ সালে আমি খুলনায় আসার পর তাঁর সাথে পরিচিত হই। প্রতিদিনই তিনি ধর্ম সভায় আমার চেম্বারে আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন ও আড্ডা জমিয়ে তুলতেন। আমার বাসাতেও তিনি প্রতিদিন আসতেন এবং আমার পারিবারিক বন্ধু হিসাবে সবার সাথে মিশতেন। এই সময় তিনি সন্দীপন সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আবৃত্তিতে তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্য। মনে পড়ে কোন একটা অনুষ্ঠানের জন্যে রিজিয়া আপার বাসায় বেশ কিছু আবৃত্তিকারীদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই উদাত্ত ভরাট সুমধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করা–

'জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান–
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে!
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন, গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে,
জয়লোভে যশোলোভে, রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।'

– আজো আমার কানে ভেসে আসে।

এই সময় তিনি কিছুদিন টুটপাড়ায় নজরুল ইসলামদের বাসায় থাকতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ওই বাড়ীতে কিছু কিছু রাজনৈতিক গোপন বৈঠকও আমরা করেছি। অনেকদিন পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর ধীরে ধীরে তাঁকে আমরা পার্টির ক্রিয়াকাণ্ডের মাঝে টেনে আনতে চেষ্টা করি। অবশ্য তিনি প্রায়ই পার্টির অনেক কাজ কর্মের সমালোচনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং হাজী মহসিন রোডে বাসা নেন। যেখানে অনেক সময় আমি গেছি। এই সময় তিনি সাধারণ বীমাতে যোগ দেন। এভাবে বেশ চলছিল। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে জানতে পারি তিনি দক্ষিণ খুলনায় "Heeds" নামে একটি সাহায্য সংস্থায় চাকুরী নিয়েছেন। কিছু দিন পরে তিনি আবার খুলনায় ফিরে আসেন এবং সাধারণ বীমা কোম্পানী তাঁর সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছিল তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তিনি পুনরায় ওই চাকুরীতে যোগ দেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি খুলনা স্কুল অব মিউজিকের স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন। পরবর্তীতে তিনি বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের খুলনা শাখার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নেন। বহুবার তিনি ভাষা সৈনিক হিসাবে শহীদ হাদিস পার্কে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন।

তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে পারম্পর্য রক্ষা করে কিছু লেখা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। তাই উপরিউক্ত বক্তব্যে অনেক কিছু উলট পালট হয়ে যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো তার মত একজন স্বচ্ছ জীবন বোধ সম্পন্ন শৈল্পিক দৃষ্টি ভঙ্গিযুক্ত মানুষ আমার জীবনে খুব কমই এসেছে। অনেক ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার মত বিরোধ থাকলেও মৌলিক প্রশ্নে আমরা সব সময় একই ছিলাম। সর্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করতো। তিনি একদিকে যেমন অনেক বিষয় সমালোচনা করতেন এবং তাঁর নিজের বক্তব্য তুলে ধরতেন অন্যদিকে সত্য সুন্দর ও নান্দিকতার দিকে তাঁর ছিল অদ্ভুত আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, শিল্প সমাজ কর্মে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাহিত্যিক ও শিল্পীর সাহিত্য ও শিল্পকর্মে তিনি পেতেন এক মানসিক ঐশ্বর্য ও আনন্দের সন্ধান।

এই সময় তাঁর সাহচর্যে আমি আলোকচিত্রে আগ্রহী হই। তাঁর এই বিষয়ে প্রচুর

উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। আমাকে তিনি বিভিন্ন ফটোগ্রাফীর কমপজিশন, আলোর বিভিন্নতা ও নিয়ম নীতি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাতেন। আমাদের আলোচনার মাধ্যমে অনেক তাত্ত্বিক বিষয় আমি উপলব্ধি করি। 'পোরট্রেটে'র উপর একটা বই আমাকে তিনি দেন এবং বইটা আজো আমার কাছে আছে।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যু আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত দেয়। কদিন আগে তাঁর সাথে আমার হঠাৎ দেখা হয় ঢাকা স্টেডিয়াম এ। তিনি বললেন তিনি ঢাকায় বর্তমানে আছেন। তার কদিন পরই তাঁর মৃত্যুর খবর।

আমার অগ্রজ

জিল্লুর রহীম

১৯৯৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ প্রায় প্রতি সন্ধ্যেবেলা এবং কোনো কোনো ছুটির দিনে সকাল দশটার মধ্যে স্যার ইকবাল রোডস্থ 'টাউন মেডিক্যাল স্টোরে' বা 'নিউজ কর্ণারে' উপবিষ্ট দেখা যেতো নাতিদীর্ঘ, সুস্বাস্থের অধিকারী, পরিচ্ছন্ন বেশভূষা সজ্জিত পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার আভায় উদ্ভাসিত হাস্যময় বুদ্ধিদীপ্ত বিদগ্ধ ও আকর্ষণীয় মুখমণ্ডলের অধিকারী একটি ব্যক্তিত্ব আপন বৈশিষ্ট্যে যিনি অদ্বিতীয়, সংযত ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী যুক্তি ও বাক্‌বৈদগ্ধে অতুলনীয় এবং বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ও শানিত শব্দাবলীর প্রয়োগে সমৃদ্ধতর ক'রে শ্রোতার হৃদয়-বুদ্ধি ও শ্রবণকে একসূত্রে বেঁধে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতেন সেই মিজানুর রহিম তাঁর অগণিত বন্ধু, ভক্ত, স্তাবক ও পরিজনদের প্রায় অজ্ঞাতসারে নশ্বর পৃথিবীর মায়াবন্ধন ছিন্ন ক'রলেন ১৯৯৩-এর সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে চিকিৎসকের আকস্মিক একটি ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তে।

মিজানুর রহিম আমার অগ্রজ। চেতনার উন্মেষলগ্ন থেকেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে মাতা-পিতার সাথে সাথেই এই মুখশ্রীর সাথে আমার পরিচয়, যেহেতু পিতামাতার আমরাই মাত্র দু'টি সন্তান। তাই পরিবারে আমাদের এই সম্পর্ক ছিলো ভ্রাতৃসুলভ নয়– বন্ধুসুলভ। খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে, গৃহঅভ্যন্তরে সদা সর্বদা আমরা ছিলাম পরস্পরের সঙ্গী, পরস্পরকে তাই উপলব্ধি ক'রেছি আমরা পরম আন্তরিকতায়, অতি দৃঢ়মূল ছিলো আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। শুধু বন্ধুত্ব-ই নয়, তিনি ছিলেন আমার জীবনবেদের রূপকার– বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক।

১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে জন্ম এবং ১৯৯৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লোকান্তর। এ জীবনকালের ব্যাপ্তি নিঃসন্দেহে যদিও দীর্ঘজীবন-জ্ঞাপক নয় তবে স্বল্পায়ু রূপে অভিহিতও যথার্থ নয়। প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁর পরিমিত জীবনকালের মধ্যে গড়ে তোলেন তাঁর জীবন- দর্শন। মিজানুর রহিমের জীবন-দর্শন ছিলো সাম্যবাদী ও মানবতা ভিত্তিক। এমন একটি ক্রান্তিলগ্নে আমাদের জীবনের উত্তরণ কাল যে সময়ে সংশয় ও প্রলোভন আমাদের করে পথচ্যুৎ, আদর্শভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ি আমরা, সেই লগ্নে নিঃসংশয়, নির্লোভ, সংস্কারমুক্ত ও মানবতাবাদে দীক্ষিত মিজানুর রহিমের জীবনের উত্তরণ চরম বলিষ্ঠতারই পরিচায়ক। তাই পাকিস্তানের জন্ম বা ভারত বিভাগের

ঐতিহাসিক প্রহসনকে গড্ডালিকার মতো অন্ধ সমর্থনের দর্শনকে আজীবন স্বীকৃতি দিতে পারেন নি।

রাজনৈতিক চিন্তা-জগতে মিজানুর রহিম ছিলেন বামপন্থী। বামপন্থী চিন্তা বিজ্ঞান-আশ্রয়ী। এ চিন্তা জগতে তাঁর গুরুরূপে যে ব্যক্তির পরিচয় অনেকের-ই অজ্ঞাত– তিনি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের তৎকালীন (১৯৪৮-১৯৫০) ইংরাজী ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক এবং নড়াইলের অপর এক ইংরাজীর অধ্যাপক ফরিদ-উদ-দাহার– ডাঃ সাইফউদ্ দাহারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নড়াইল কলেজ থেকেই মিজানুর রহিম ১৯৫০ সালে আই. এ. পাস করেন। নড়াইলে অবস্থান কালীন সময়ে মিজানুর রহিমের আন্তরিক গুণাবলীর অন্যতম গুণের বিকাশ ঘটে। সাহিত্যের প্রতি পূর্ব থেকেই আকৃষ্ট, ঐ সময়ে সক্রিয় সাহিত্য সৃষ্টির আকর্ষণে কবিতা রচনার শুরু। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ ক'রে কলকাতার অনেক সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হ'তে দেখেছি। এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত খোন্দকার ইলিয়াস সম্পাদিত 'যুগের দাবী' সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে। এছাড়া কলেজ বার্ষিকীতেও তাঁর রচনা দেখেছি।

১৯৫০ সালে দৌলতপুর কলেজ ভর্তি হন ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বিরোধী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকায় অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকতে হ'য়েছে এবং নিয়মিত পড়াশুনা ব্যাহত হওয়ায় একবার স্নাতক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। ১৯৫৪ সালে পূর্বপাকিস্তানে প্রাদেশিক নির্বাচনে বিরোধী রাজনীতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে মুসলিম লীগ রাজনীতি করবার জন্য তাঁকে এক লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব দেয়া হয়। সে প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যখ্যান করেন, ফলশ্রুতি, তিনি নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তাঁর পরিচয় ঘটে কবি-নাট্যকার ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য অন্যতম ব্যক্তিত্ব ধনঞ্জয় দাশের সাথে। ধনঞ্জয় দাশের 'আমার স্বদেশ বাংলাদেশ' গ্রন্থে তিনি মিজানুর রহিম সম্পর্কে কিছু বলিষ্ঠ মন্তব্য রেখেছেন। ১৯৫৪ সালে কারাগার থেকে মিজানুর রহিম স্নাতক পরীক্ষায় আবির্ভূত ও উত্তীর্ণ হন।

১৯৫৮ সালে আইন পাস ক'রে আইন ব্যবসায়ের জন্য দুবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হন। আইনজীবীদের আচার আচরণ তিনি কখনো আত্মস্থ করতে পারেন নি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও পরবর্তীকালে মুসলিম সাধারণ বীমায় চাকরী গ্রহণ করেন ও অবসর প্রাপ্তি পর্যন্ত কর্পোরেশনের সাধারণ বীমা বিভাগে চাকরীরত ছিলেন। চাকরীরত অবস্থাতে ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। খুলনা বেতারের সঙ্গেও তিনি সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সহজাত আরো কিছু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রথম শ্রেণীর কবিতা আবৃত্তিকার ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী ও আফ্রিকা কবিতা দু'টি তিনি আবৃত্তি করতেন যা শ্রোতার কাছে নতুন চমক ও অনুভূতির সৃষ্টি করতো। মঞ্চাভিনয়েও তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। স্কুল অব মিউজিক রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ রূপক

নাটকটি মঞ্চস্থ করে। উক্ত নাট্যানুষ্ঠানে তিনি রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয় শেষে তৎকালীন ডি. সি. আবুহেনা গ্রীণরুমে এসে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন- "অপূর্ব! আপনি রাবীন্দ্রিক ঢং ও বাক্‌ভঙ্গিমাকে এ্যাতো সার্থক ভাবে আয়ত্ব ক'রলেন কী ভাবে?"

কোনোগুরু বা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে বাল্যকাল থেকেই ছিলেন চিত্রাঙ্কনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। অবলীলায় অঙ্কন করতেন ছবি। তাঁর অঙ্কিত ছবি, রং-এর সমাবেশ, তুলি বা পেন্সিলের বলিষ্ঠটান স্মরণ করিতে দেয় প্রথাসিদ্ধ না হ'লেও তিনি একজন চিত্রশিল্পী।

অপূর্ব সুন্দর হস্তলিপি ছিলো তাঁর। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকারের হস্তাক্ষরে তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। মনে-প্রাণে একজন শিল্পীছাড়া এতো শৈল্পিক গুণের সমাহার সচরাচর অ-দৃষ্ট।

সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ ছিলো প্রগাঢ়। সঙ্গীত শিল্পীরূপে তিনি পরিচিত ছিলেননা কখনো কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি নিতান্ত অগভীর ছিলোনা। স্কুল অব মিউজিকের প্রতিষ্ঠাতা খুলনার অপর এক কৃতি সন্তান আজীজ খান ও সঙ্গীত শিল্পাচার্য সাধন সরকারের সাহচর্যে ও প্রভাবে মিজানুরও সঙ্গীত সম্পর্কে অনুশীলন ক'রেছেন।

শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গণেই তাঁর পদচারণা সীমিত ছিলোনা। সাম্যবাদী চেতনার এই মানুষটি ছিলেন একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ। এবং তাঁর প্রতিবাদের ভাষাও ছিলো শাণিত, নির্মম ও কঠোর।

বিচিত্র ও বহুবিধগুণের সমন্বয় ছিলো এ মানুষটার মাঝে। কিন্তু যেমন ঘটে প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর ক্ষেত্রে-মিজানুরও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। হয়তো এটা মনোজগতেরই প্রভাব-মনোবিজ্ঞানে যেমন বলা হয়, Contradiction is the human character- বৈপরিত্যই মানুষের চরিত্র। বিভিন্ন সদ্‌গুণের সাথে তার বিপরীতমুখী গুণ ও মানুষ ধারণ করে। হয়তো সেই বিপরীতমুখী গুণের সমন্বয়ও ছিলো তাঁর চরিত্রে। এই 'গুণ' টি হ'চ্ছে 'আলস্য'। তাঁর মেধা, মনন ও চিন্তন অনুযায়ী তাঁর কর্মক্ষেত্রে বিরাজ ক'রছে একটা বড়ো শূন্যতা। এতো প্রজ্ঞা ও বিচিত্রগুণের অধিকারী- তবুও তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলস্য ও ঔদাসিন্য। পঠনে-পাঠনে সমকক্ষহীন, বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, বাক্‌বৈদগ্ধে অদ্বিতীয় - সৃজন ক্ষেত্রে তাঁর আলস্য আমাদেরকে ক'রেছে বঞ্চিত। তবুও তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা অবশ্যই কিছু রয়েছে এবং এঁরূপ আশা পোষণ নিশ্চয়ই অসমীচীন হবে না যে, উক্ত রচনাবলী প্রকাশে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন তৎপর হবেন এবং সেটাই হবে মিজানুর রহিমের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আন্তরিক প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ।

১৯৯৩-এর ৬ তারিখে খবর পেলাম মিজানুর রহিম অসুস্থ, মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত। ৮ তারিখে ঢাকা পৌছুলাম। ধানমণ্ডির একটা ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। ঐ রাতেই সাক্ষাৎ করলাম। জানলাম ও দেখলাম ক্রমোন্নতি ঘটছে। ১০ তারিখে জানলাম আর তিন দিন পরে ক্লিনিক থেকে Release ক'রে দেবে। সুস্থতার ক্রমোন্নতি দেখে

"আবার শিগ্‌গিরই আমাদের দ্যাখা হবে" একথা ব'লে ১০ তারিখে রাতের বেলা বিদায় নিয়ে এলাম। প্রায় সুস্থ, শান্ত স্বাভাবিক প্রশান্ত হাস্যে আন্তরিক ভাবে আমার সাথে করমর্দন ক'রলেন, সে স্নেহকোমল স্পর্শ এখনও অনুভব করি, সুস্থ হ'লে খুলনায় আসবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে বিদায় জানালেন। ১১ তারিখে খুলনায় ফিরে এলাম। বান্ধব-স্বজনদের জানালাম তাঁর সুস্থতার ক্রমোন্নতির কথা এবং শিগ্‌গিরই Release ক'রে দেবার কথা। ১৩ তারিখে রাত ১১টার সময় ঢাকা থেকে সংবাদ এলো টেলিফোন যোগে ঐ দিন বিকেল বেলা ১৫ লাখ পেনিসিলিনের অপপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত মিজানুর রহিম অনন্তের পথে চিরযাত্রা করেছেন ঐ রাতে ৮-৩০ মিনিট সময়ে। অঞ্জনের শোকাবেগ ও উচ্ছ্বাসাবদ্ধ ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে শুনলাম জীবনের অন্যতম গভীর শোক সংবাদ। একটা দার্শনিক সত্য বিদ্যুৎশিখার মতো মনের আকাশে ঝলসে উঠলো- "We appear only to disappear." ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের কথা রেখেছিলেন- তিন দিনের মধ্যেই তাঁরা দিয়ে দিলেন মুক্তি- মহামুক্তি- চিরমুক্তি।

কাছের মানুষ মিজান সাহেব

সুফিয়া খানম

১৩ই সেপ্টেম্বর '৯৩ রাতে ফুফুর (ডাঃ শামছুন্নাহার) টেলিফোনে জানতে পারলাম মিজান সাহেব আর নেই। জেনেছিলাম অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু-! খবরটা শোনবার পর মনে হল আমাদের অনেক কাছের মানুষটিকে আর কাছে পাবনা। শিশু মনোজাগতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে যে মানুষটির কাছ থেকে না চাইতেই অনেক পেয়েছি, হাত বাড়ালেই যিনি কখনও নিরাশ করেননি, সেই মিজান সাহেব আর নেই। তার এই হঠাৎ চলে যাওয়াটা ঠিক মেনে নিতে পারছিলাম না। মনে পড়ছে অনেক কথা.....

১৯৭২ সালে স্কুল-অব-মিউজিকের যন্ত্র বিভাগে (গীটার) ভর্ত্তি হওয়ার পর স্কুলের অফিস ঘরে খুলনার অনেক গুণী জনের দেখা পাই। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের রিহার্সেলে তাঁরা আসতেন, ছাত্র ছাত্রীদের রিহার্সেল দেখতেন, অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যে এক ভদ্রলোককে দেখতাম, তিনি প্রায়ই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা, গ্রন্থনায় থাকতেন, আবৃত্তি করতেন। তখন তাকে চিনতাম অঞ্জন, পান্থ, তন্বীর বাবা হিসেবে। স্কুল-অব-মিউজিকের শান্তিধামে আজিজ খানের জীবিত কালে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ গীতি নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা হয় ও সেই অনুযায়ী রিহার্সেলও শুরু হয়। তাসের দেশের রাজার চরিত্রে ছিলেন যিনি, তিনি আর কেউ নয় অঞ্জন, পান্থের বাবা মিজানুর রহিম সাহেব। তখন সকলের কাছে তাঁর ডাক নাম রাজা সাহেব। এর কিছুদিন পর স্কুলের সর্বময় কর্তা আব্দুল আজিজ খান সাহেব দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে মারা গেলে, তখনকার মত রিহার্সেল বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯৭৬ সালের মে, জুন মাসে শেরে বাংলা রোডস্থ স্কুল-অব-মিউজিকের নিজস্ব স্থানে তাসের দেশ পুনরায় মঞ্চস্থ করার জন্য অভিনয়ের রিহার্সেল শুরু হয়। এখানে রিহার্সেলের সময়ই রাজা সাহেবের কাছাকাছি যাওয়ার কিছুটা সুযোগ ঘটে। আজিজ খান সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুল-অব-মিউজিকের সেই জমজমাট ভাবটা কেমন জানি স্তিমিত হয়ে আসছিল। আমাদের আসা যাওয়াও কেবলমাত্র ক্লাসের দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল।

মাঝে পড়াশুনার জন্য কিছুদিন খুলনায় ছিলাম না। ফিরে এসে দেখলাম যে স্কুল-অব-মিউজিক দেখে গিয়েছিলাম সে স্কুল আর নেই। সংগীত বিভাগের দৈন্যদশা দেখে, স্কুলে আসার উৎসাহ আর পেলাম না। পড়াশুনা শেষে অনেক দিন কোন কাজ ছিল না। এমন সময় ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি সময় শিশু মনোজাগতিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেই। পরে শুনেছি, আমার এই পদে নিয়োগের ব্যাপারে স্থায়ী কমিটির কাছে স্কুলের সভানেত্রী ডাঃ শামছুন্নাহারের প্রস্তাবে যিনি প্রথম সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন, তিনি তাসের দেশেরই রাজা সাহেব। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে তখন তিনিই শুধু আমাকে চিনতেন।

যেদিন প্রথম স্কুলে যোগদান করি ১৭ই জুলাই '৮৩ সেদিন স্কুলের সভানেত্রী ডাঃ শামছুন্নাহার ও মিজানুর রহিম সাহেব আমাকে অফিসে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মিজান সাহেব আমার হাতে তুলেন দেন একটা স্ট্যাপলার মেশিন, পাঞ্চিং মেশিন ও লম্বা একটা খাতা। সেই খাতায় প্রতিদিনের ছাত্র বেতন কিভাবে লিখতে হবে, তিনি নিজে হাতে লিখে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর চলার পথে বারবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্থায়ী কমিটির সভানেত্রী ছাড়া একমাত্র তিনিই ছিলেন আমাদের একান্ত কাছের মানুষ। তিনি নিজে থেকেই স্কুলে যাতায়াত করতেন, খোঁজ খবর নিতেন।

স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠানে বা সমস্যায় যখনই আমরা তার দ্বারস্থ হয়েছি, তখনই তিনি সানন্দে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। নতুন যে কোন পদক্ষেপে সব সময়ই তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে চলার উৎসাহ দিতেন, পরামর্শ দিতেন। ভয় পেলে হাত ধরে নিয়ে যেতেন। একবার মনে আছে '৯৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী (সেটাই তাঁর স্কুলের শেষ অনুষ্ঠান) বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সেদিন বিচারক হিসাবে তিনি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে তিনি তখন আমাকে ও মিনুস্যারকে তাঁর সঙ্গী হিসাবে ঠিক করলেন। আমি তো জীবনে কখনও বিচারক হইনি। ভয় পাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, বসো ঠিক পারবে। অনেক সতর্ক হয়ে নম্বর দিচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাঁর সঙ্গে আমার খুব একটা তারতম্য হয়নি। ঐদিন উনি উৎসাহ না দিলে কোন দিনই ওইকাজ করার মত সাহস আমার হত না।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন একরোখা, স্পষ্টবাদী, দূর্মুখ ও বলা চলে। অনেকদিন আগের একটা ঘটনা, আমি ছাত্রী। খুলনা বেতার কেন্দ্রে ছোটদের আসরে স্কুল-অব-মিউজিক আজিজ খানের লেখা 'বাদুড়ের দেশে' গীতি নাটক করবে। এই নাটকের কিছুটা অংশ রেডিওর লোকজনদের পছন্দ হলনা। বাদ দিতে চাইলো। এই কথা শুনে তিনিতো রেগে আগুন। আমাদের নিয়ে তিনি চলে আসতে উদ্যোত হলেন। তার এই রাগ দেখে রেডিওর লোকেরাই শেষ পর্যন্ত আপোষে আসলো। তিনি তার মতে অটল থাকলেন। সেইভাবেই 'বাদুড়ের দেশে' প্রচারিত হল।

চাকরী থেকে অবসর নেবার পর, অনেক দিন খুলনায় একা একা থাকা কালে

যাতায়াতের পথে তিনি প্রায়ই স্কুলে আসতেন। আমাদের সাথে গল্পগুজব করতেন। গল্পের বিষয় কি যে ছিলনা। মজার অভিজ্ঞতার গল্প, সাহিত্য, ছবি, গান, ফটোগ্রাফী, ফুলগাছ, বনসাই এমন কোন জিনিষ ছিলনা, যেখানে তার উৎসাহ ছিলনা। এসব ক্ষেত্রে তার ছিল বয়সের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও যুবকের উৎসাহ, উদ্দীপনা। তিনি কখনও বয়সকে মানতেন না। রিক্সায় চড়তেন না। যুবকের মত কেডস পায়ে, গেঞ্জি পরে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে চলতেন। পার্কে ছোলা, বাদাম, ফুচকা খেতেন। একা একা ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়তেন। ছবি তুলে আমাদের দেখাতেন। সেই সব ছবিতে তিনি কিভাবে লেন্স এ্যাপারচারের ব্যবহার করেছেন বলতেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতাম কিভাবে টবে ফুল ফোটাতে হয়, বনসাই পরিচর্যা করতে হয়। ঢাকা যাওয়ার আগে প্রায়ই বলতেন, তুমি স্কুলের উপরে তোমার কোয়ার্টার্স বানাও। ঢাকা থেকে এসে এখানে সবাই মিলে থাকা যাবে। তুমি রান্না করবে, আমরা সবাই মিলে খাব, গল্প করবো। ঢাকা যাবার দিন দুপুরে তিনি অনেকক্ষণ স্কুলে ছিলেন। কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা হবেন কি? উত্তরে বলেছিলেন, আমার সে ধরণের কোন ইচ্ছা নেই। ঢাকার লোকগুলোকে আমার কেমন জানি লোভী লোভী মনে হয়। ঢাকা আমার ভাল লাগেনা। আমার যা কিছু, সবই খুলনায়। আমি মাঝে মাঝেই খুলনায় তোমাদের কাছে আসবো। যাবার মাসখানেকের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খুলনায় আসা তার আর হয়ে উঠলো না। যে ঢাকাকে তিনি পছন্দ করতেন না সেই ঢাকাতেই তাকে থেকে যেতে হল। স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠানে এখন আমরা তার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করি। কিন্তু তিনি নেই, একথা মনে হয় না। তিনি আছেন ঢাকায় আছেন, আমাদের মনে আছেন, অনুভবে আছেন।

স্মরণার্থে প্রার্থনা

মাহমুদ আলম খান

রাশিয়া থেকে ফিরে এসে শ্রী নিকেতন-এর বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'এসো তোমরা, প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে। গানে গীতে কাব্যে কথায় অনুষ্ঠানে আনন্দে শিক্ষায় দীক্ষায় চিত্ত জাগুক।'

সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু বিস্তৃত চিন্তাভাবনা গুলিকে বাস্তব মূর্তি দেবার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে রাশিয়া দেখে ফিরে আসার পর তাঁর এই আহ্বান আমাদের চিত্তে কতটুকু সাড়া জাগিয়েছিল সে বিচারের ফলাফল যাই হোক, শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল, আদর্শ ছিল। সে আদর্শ একান্তই রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব নন্দিত এবং শান্তিনিকেতনও বাঙ্গালীর কাছে প্রিয়। বিভিন্নভাবে তার সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি– কল্পনার এক নিদর্শনও বটে। প্রতিষ্ঠান বড় হোক, ছোট হোক যারা তার স্রষ্টা তাদের উদ্দেশ্য থাকে এবং আহ্বান থাকে।

শ্রী নিকেতনে চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ সৃষ্টির একটা কল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথের। আবার ১৯২৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে বিশ্ব ভারতীর ছাত্রদের সভায় চীন বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাবও গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের সাথে তুলনা করছিনা। রবীন্দ্র অনুরাগীর কথা এখানে বলার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্কুল অব মিউজিক তার কথা প্রসঙ্গে একটি উদ্যোগ ও প্রয়াসের দিকটিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

আজিজ খান গভীর রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। রাশিয়া ও চীনে সমাজ পরিবর্তনের সাফল্যের প্রভাবে এদেশে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে যারা প্রভাবিত হয়ে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাদেরই একজন আজিজ খান।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকালে মনে হতে পারে এসব প্রয়াস মূল্যহীন। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নেই। চীনেও সমাজতন্ত্র থাকবে কিনা সন্দেহ গভীরতর হচ্ছে। অন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্ব ভারতীর আজকের চেহারার পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটতে পারত, অনুসরণীয় হতে পারত।

যে উদ্দেশ্যে এবং আদর্শে স্কুল অব মিউজিক-এর প্রতিষ্ঠা, আজকের পরিস্থিতিতে

মনে হতে পারে একটি ব্যর্থ প্রয়াস। কিন্তু সব কথাই শেষ কথা নয়। আজিজ খান বেঁচে নেই। কিন্তু জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মত বেঁচে আছে স্কুল অব মিউজিক। প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটি বিলীন হয়ে যায়নি। বিচ্যুত হয়নি লক্ষ্য পথ থেকে। যেটুকু কর্ম, যে আয়োজন এখন পর্যন্ত চালু আছে তা ঐ একই আদর্শে নিবেদিত।

আর ৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আজও স্কুল অব মিউজিক সহজেই আলাদা করে চোখে ধরা পড়ে। এখানেই প্রতিষ্ঠার সাফল্য। আজিজ খানের সাফল্য ও প্রয়াসের ফসল ধরে রেখেছেন তার উত্তর পুরুষ। এই প্রসঙ্গে আজিজ খানের স্ত্রী ডাঃ শামছুন্নাহারের অবদান অনস্বীকার্য। এতটুকু বেশী করে বলছি না। যারা ডাক্তার নাহারকে জানেন তারাই এর স্বীকৃতি জানাবেন। আজিজ খানের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর স্কুল অব মিউজিকের যে প্রাণশক্তি, আজিজ খানের উদ্যোগ ও প্রয়াসের উৎস ও প্রেরণা জুগিয়েছেন ডাক্তার শামছুন্নাহার। বলা যায় একশ ভাগ অতীতে এবং আজও।

দেশেরও বলবনা, জাতিরও বলবনা, স্কুল অব মিউজিকের সাথে জড়িত সকলেই স্থানীক ভাবে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। স্মরণীয় আদর্শের কারণে। একই আদর্শের পতাকা বহনকারী হিসেবে যে তিনজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের স্মরণে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ তারও মূলে ঐ একই আদর্শ বাহিত। আজিজ খান, সাধন সরকার ও মিজানুর রহিম। নাম গুলো এভাবে সাজিয়েছি তার মধ্যে কোন বিশেষ কারণ নেই, কোন লক্ষ্য নেই। বড় ছোট বলারও উদ্দেশ্য নেই। আদর্শের পতাকাবাহীরা একজনের হাত থেকে পতাকা তুলে নিয়ে নিজে বহন করে যতক্ষণ সে জীবিত থাকে। নির্মম যে সত্য মৃত্যু, সেই মৃত্যুর ধারাবাহিকতায় নাম গুলো সাজিয়েছি পরপর। আজিজ খান প্রথমে তুলেছিলেন আদর্শের পতাকা। মিজানুর রহিম শেষে। এক বছর পূর্বে মিজানুর রহিম শেষ বিদায় নিয়েছেন।

আজিজ খান, সাধন সরকার ও মিজানুর রহিমের মধ্যে একটা মিল স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল তাঁদের সকলের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসেছেন সাহিত্য ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। তার মধ্যে খাদ ছিল না। একেবারে খাঁটি সোনার মত নিখাদ ছিল তাঁদের ভালবাসা। আজকাল খাদ মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সোনার গয়না বানিয়ে এবং তা পরিধান করে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির যে চতুর প্রয়াস প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়, এই তিনজনের মধ্যে তার চিহ্ন মাত্র ছিলনা।

আর একটি দিকও খুব স্পষ্ট। এই ত্রয়ী ছিলেন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত প্রাণ। কোন আপোষ করেননি। আপোষ করলে জাতীয় পরিসরে তিনজনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন। তিনজনকে ঘিরে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার যে আক্ষেপ অনেকে করে থাকেন, সেটা কখনই সম্ভব ছিল না এবং কামনা করাও উচিত নয়। কারণ তক্‌মা আটা এক উদ্ভট শোষণের সমাজে তক্‌মাধারী এবং এই তিনজনকে এককাতারে ফেলা হলে তাঁদের আদর্শের প্রতি অবিচার করা হয়, অপমান করা হয়। ছলনা প্রবঞ্চনা বেড়ে যায়। গোটা দেশটা না বদলে, সমাজকে পরিবর্তন না করে এঁদের ঘুণে ধরা এই সমাজে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাই ব্যর্থ হয়েছে। এটাকে ব্যর্থতা বলাও উচিত নয়। যোগ্য সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং

অন্য সমাজ ব্যবস্থা। সেটা অর্জিত হলেই এরা সম্মানিত হবেন, মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

এদের জীবন কর্ম এবং জীবন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরছিনা এই লেখায়। এদের মিলন ঘটেছিল স্কুল অব মিউজিকে আদর্শের কারণে, একই সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে। আজকের দিনে আমরা বারবার বলি বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। এটা এক ধরনের প্রার্থনা। প্রার্থনা সচরাচর সৃষ্টিকর্তার নিকট। এ প্রার্থনা মানুষের কাছে। মহান ব্যক্তিদের আদর্শের দীর্ঘায়ু কামনা করি সেটাও প্রার্থনা। এই প্রার্থনাও মানুষের নিকট। আমিও সেই প্রার্থনা করি। তামসিক প্রাণে নয়, তাপস মনে।